Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৮তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০১৪

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

১৮তম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা ডিসেম্বর ২০১৪

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

(১) মালালা ও নাবীলা : ইতিহাসের দু'টি ভিন্ন চিত্র

গত ১০ই অক্টোবর সুইডেনের নোবেল কমিটি পাকিস্তানের ১৭ বছরের তরুণী মালালা ইউসুফযাইকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে। মালালা হ'ল এযাবৎকালের সর্বকনিষ্ঠ এবং পাকিস্তানের দ্বিতীয় নোবেল জয়ী। মালালা শান্তির জন্য কি কাজ করেছে যে, তাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে? এরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে নোবেল কমিটির সভাপতি বলেন, 'বয়সে তরুণ হলেও গত কয়েক বছর যাবৎ তিনি নারীশিক্ষার অধিকার আদায়ে লড়াই চালিয়ে আসছেন। শিশু ও তরুণদের সামনে তিনি এই নযীর গড়েছেন যে, নিজেদের অবস্থার উন্নয়নে তারাও অবদান রাখতে পারে। আর এ লড়াই তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন সবচেয়ে বিপদসংকুল পরিস্থিতির মধ্যে থেকে'। তখন একজন সাংবাদিক বলেন, অংঢ়রৎধঃরড়হং নঁঃ যধংহঃ ধপযঁধষষু ফড়হব ধহুঃযরহম (স্রেফ আশাবাদ; কিন্তু বাস্তবে সে কিছুই করেনি)। একথা শুনে সভাপতির চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং তার মুখে কোন উত্তর ছিল না।

১৯৯৭ সালের ১২ই জুলাই পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকার সিঙ্গোরা গ্রামে মালালার জন্ম। তার পিতা যিয়াউদ্দীন ইউসুফযাই এলাকায় একটি স্কুল চালাতেন। অতঃপর ২০১২ সালের ৯ই অক্টোবর স্কুলযাত্রী ১৫ বছরের মালালাকে তালিবানরা গুলি করে। যা তার মুখে ও মাথায় লাগে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব মিডিয়ায় তালেবানের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। অতঃপর দেশে ও বিদেশে চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে মালালা এখন যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে পিতার সঙ্গে অবস্থান করছে। বর্তমানে সে বিশ্ব মিডিয়ায় শীর্ষ নারী এবং সকলের নিকট অতি পরিচিত একটি নাম। মালালা সর্বদা অহিংস নীতির কথা বলছে। অথচ তার জন্মস্থানেই যে আরেক নোবেলজয়ী ওবামার হুকুমে প্রায় প্রতিদিনই ড্রোন হামলা হচ্ছে এবং তাতে প্রাণ হারাচ্ছে অগণিত নিরপরাধ নারী-শিশু, সে বিষয়ে মালালার কোন কথাই শোনা যাচ্ছে না। মালালার নোবেল প্রাপ্তির ৭ দিনের মাথায় ইস্রাঈলী সেনাবাহিনী গাযায় ১৩ বছরের এক কিশোরকে গুলি করে হত্যা করেছে। এমনকি গত জুলাইয়ে সর্বশেষ ইস্রাঈল-হামাস যুদ্ধে ওবামার দেওয়া অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যে ইস্রাঈল পাঁচ শতাধিক নিরপরাধ শিশুকে হত্যা করেছে, তাদের বিরুদ্ধেও মালালার কোন শব্দ শোনা যায়নি। তাহ'লে ব্যাপারটা আসলে কি?

এবার চলুন, ইতিহাসের আরেকটি চিত্র অবলোকন করি। মালালা গুলিবিদ্ধ হওয়ার মাত্র ১৫ দিনের মাথায় ২০১২ সালের ২৫শে অক্টোবর একই এলাকা পাকিস্তানের উত্তর ওয়াযীরিস্তানে ৯ বছরের শিশু নাবীলা তার ৬৭ বছরের দাদীর সাথে বাড়ীর

পাশে নিজেদের ক্ষেত থেকে সবজি তুলছিল। এমন সময় মার্কিন ড্রোন বিমানের হামলায় দাদী নিহত হন ও নাবীলা গুরুতরভাবে আহত হয়। যাতে তার চোখ নষ্ট হয়ে যায়। অথচ এই মর্মান্তিক ঘটনা বিশ্ব মিডিয়ায় কভারেজ পায়নি। অতঃপর কিছুটা সুস্থ হয়ে নাবীলা পিতার সাথে যুক্তরাষ্ট্রে যায় দাদী হত্যার বিচার চাইতে। মার্কিন কংগ্রেসের শুনানীতে প্রায় ৪৩০ জন সদস্যের মধ্য থেকে মাত্র ৫ জন আসেন নাবীলার কথা শুনতে। নাবীলার পিতা দোভাষীর মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্যে তার অভিযোগ পেশ করে বলেন, একজন শিক্ষক হিসাবে আমি আমেরিকানদের জানাতে চাই যে, আমার পরিবার ও সন্তানেরা কতই না ক্ষত-বিক্ষত'! এ সময় তার দু'চোখ বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। নাবীলা প্রশ্ন করল, আমার দাদীর কি অপরাধ ছিল? পিনপতন নীরবতায় সেদিন উক্ত প্রশ্নের উত্তর কেউ দেয়নি। বরং মার্কিন আইন প্রণেতাগণ ও তাদের আদালত বিষয়টিকে চরম ভাবে 'অবজ্ঞা' করে এবং নাবীলা ও তার পরিবারের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলাচলে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়। সাংবাদিকদের সংস্পর্শে যাতে তারা যেতে না পারে সে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। উল্টা সেদেশের কথিত স্বাধীন গণমাধ্যম তাদের যুক্তরাষ্ট্রে আগমনকে 'আন-ওয়েলকামড' (অবাঞ্ছিত) বলে শিরোনাম করে।

মালালা ও নাবীলা একই স্থানের একই রকম মর্মান্তিক ঘটনার শিকার। অথচ বিশ্বব্যাপী তার প্রতিক্রিয়ায় বিপরীত দুই চিত্র দেখা গেল। এর কারণ, মালালা কথিত তালেবান আক্রমণের শিকার। যাকে প্রতীক করে বিশ্বব্যাপী পাশ্চাত্যের কথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের' বৈধতা দেওয়া যায়। পক্ষান্তরে নাবীলা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের নায়কদের আসল চেহারা বিশ্বের সামনে উন্মোচন করে দিয়েছে। যা পাশ্চাত্য সর্বদা গোপন রাখতে চায়। মালালাকে নোবেল পুরস্কার ধরিয়ে দিয়ে পাশ্চাত্য অপশক্তি বছরের পর বছর ধরে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে তাদের অব্যাহত গণহত্যাকে আড়াল করতে চায়। ঠিক যেমন আফগানিস্তান দখলের অজুহাত সৃষ্টির জন্য তারা ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে নিজেরা বিশ্ব বাণিজ্যকেন্দ্র ধ্বংস করে দিয়ে তালেবানের উপর দোষ চাপায়। অতঃপর তালেবানের কেন্দ্রস্থল আফগানিস্তানে হামলা চালায়। অথচ এই তালেবান তাদেরই সৃষ্টি।

মালালা কে? পাকিস্তানের ইংরেজী দৈনিক ডন পত্রিকায় ২০১৩ সালের ১১ই অক্টোবর সংখ্যায় গধষধষধ : ঞযব ৎবধষ ংঃড়ৎু (রিঃয বারফবহপব) 'মালালা : আসল কাহিনী (সাক্ষ্য-প্রমাণসহ)' শিরোনামে যে অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাতে বলা হয় যে, মালালা পাকিস্তানী মুসলিম মেয়ে নয়, বরং ১৯৯৭ সালে পূর্ব ইউরোপের হাঙ্গেরীতে তার জন্ম এক খ্রিষ্টান মিশনারী পরিবারে। তার আসল নাম 'জেন'। ২০০২ সালে তার পিতা-মাতা তাকে নিয়ে পাকিস্তানের সোয়াত ভ্রমণে আসেন এবং মালালার বর্তমান পিতা-মাতা গোপনে খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়ায় পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে ঐ মিশনারীর পক্ষ হতে জেন-কে দান করা হয়। অতঃপর 'জেন' হয়ে যায় 'মালালা ইউসুফযাই'। তারা জেন-এর বর্তমান উচ্চাভিলাষী পিতা যিয়াউদ্দীন ইউসুফযাইকে তাদের স্বার্থে কাজে লাগায় এবং মালালা ও তার কথিত পিতাকে দিয়ে তালেবানদের বিরুদ্ধে নানাবিধ কল্পকথা আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রকাশ করতে থাকে। এভাবে তাদের পরিচিতি তুঙ্গে উঠলে মালালাকে গুলি করা হয় কথিত তালেবানকে দিয়ে। কিন্তু মালালা মরে না। চিকিৎসার নামে তাকে ও তার পরিবারকে উড়িয়ে নেয়া হয় আমেরিকায়। অতঃপর সে এখন হয়ে গেল শান্তিতে নোবেল জয়ী। কি চমৎকার নাটক! আসলে কি তালেবান তাকে গুলি করেছিল? ঐ শ্যূটারের ডিএনএ টেস্ট করে দেখা গেছে যে, সেও মালালার মত বিদেশী রক্তের অধিকারী। সম্ভবতঃ ইতালীর লোক। যাকে দক্ষ তালেবান সাজিয়ে এই হামলা করানো হয়েছে। যাতে মালালা না মরে। অথচ কার্যসিদ্ধি হয়ে যায়। রিপোর্টে বলা হয়, পাকিস্তানী ও মার্কিন গোয়েন্দা এজেন্সীগুলি যৌথভাবে এই নাটক মঞ্চস্থ করে। ডন-এর এই অনুসন্ধানী রিপোর্টে বিশ্বে তোলপাড় সৃষ্টি হলেও পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলি এ বিষয়ে নীরব থাকে। এমনকি নোবেল পুরস্কার পেতেও তাতে বাধা হয়নি। পাকিস্তানের একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মুলতানের জামশেদ দাস্তি তাই বলেছেন, ইসলাম ও তালেবানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্যই যুক্তরাষ্ট্র মালালাকে ব্যবহার করেছে'। একইভাবে বর্তমানে ইরাকের আইএস তাদেরই সৃষ্টি বলে পাশ্চাত্যের অনেক যুদ্ধবিশারদ মন্তব্য করেছেন। অতএব ইসলামের অকৃত্রিম অনুসারীগণ কখনোই তাদের পাতানো ফাঁদে পা দেবে না, এটাই কাম্য।

(২) নমরূদী হুংকার!

'তুই জঙ্গী। এখন তোর আল্লাহ কোথায়? তোকে বাঁচালে আমরা বাঁচাবো। তাছাড়া কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না'। দূর অতীতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর তাওহীদী দাওয়াতের মুকাবিলায় ইরাকের অহংকারী সম্রাট নমরূদ বলেছিল 'আমিও বাঁচাতে পারি ও মারতে পারি' *(বাক্বারাহ ২/২৫৮)*। আজ সেকথাগুলিই শুনছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার দলীয় ছাত্রী

ক্যাডারদের মুখে। যেদেশের মহিলা প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় পাইনা। সেদেশে তাঁর দলীয় ছাত্রীরা আল্লাহকেও ভয় পায় না। যারা একটি মেয়েকে তার রুম থেকে ধরে এনে পিটিয়েছে। কারণ তার কাছে 'নারী-পুরুষের পর্দা' নামে একটা বই পাওয়া গেছে। হল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ঐ নির্যাতিত ছাত্রীর কোন কথাই শোনেনি। বরং সরকার দলীয় ক্যাডারদের কথা মেনে নিয়েছে। শারীরিক ও মানসিক সব ধরনের নির্যাতন চালানো হয়েছে ঐ দ্বীনদার ছাত্রীটির উপর এবং তার মত আরও বহু ছাত্রীর উপর। অবশেষে অনেককে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে তারা। আর পুলিশ যথারীতি মিথ্যা মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছে কারাগারে এ ধরনের বহু নিরপরাধ ছাত্রীকে। 'আসুন সঠিকভাবে রোজা পালন করি' 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোরআন শিক্ষা' প্রভৃতি বইগুলোও এখন জঙ্গী বা জিহাদী বইয়ের তালিকায় চলে এসেছে।

এভাবে কোন ছাত্র বা ছাত্রী নিয়মিত ছালাত-ছিয়াম পালন করলে, কুরআন-হাদীছ, তাফসীর বা ইসলামী বই-পত্রিকা রাখলেই তাকে বলা হচ্ছে জঙ্গী। বোরক্বা পরা মেয়ে বা শিক্ষিকা, দাড়ি-টুপী পরা ছাত্র বা শিক্ষকরাও এখন জঙ্গী সন্দেহযুক্ত। হলের মসজিদগুলির সামনে সরকার দলীয় ছাত্র-ক্যাডারদের মাধ্যমে পাহারা বসানো হচ্ছে, কে নিয়মিত ছালাত আদায় করে তার রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য। তারা রুমে রুমে তল্লাশি চালাচ্ছে কার রুমে ইসলামী বই বা পত্রিকা আছে। অতঃপর ধরে এনে মারপিট, গালি-গালাজ ও নানাভাবে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। অতঃপর সরকার যাদের পসন্দ করেনা, এমন কোন একটি ইসলামী দলের তকমা লাগিয়ে দিয়ে তাকে পুলিশে দেওয়া হচ্ছে বা হল থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। ইসলাম বিরোধী মিডিয়াগুলি এ ধরনের খবরগুলি লুফে নিয়ে প্রচার করে দিচ্ছে কোনরূপ বাছ-বিচার ছাড়াই। সরকারী দলের ছাত্র বা ছাত্রী ক্যাডারদের অত্যাচার থেকে সরকারী দলের ছেলে-মেয়েরাও নিরাপদ নয় যদি তারা দ্বীনদার হয়। যেমন পত্রিকার রিপোর্ট মতে ঢাবির শামসুন্নাহার হলের এক লাঞ্ছিত ছাত্রীর অভিভাবক নেত্রকোনা যেলার একটি অঞ্চলের যুবলীগ সভাপতি তার মেয়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে 'দুঃখজনক' বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমরা সবাই নিয়মিত ছালাত আদায় করি। আমাদের পুরো পরিবার আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। অথচ আমার মেয়ের নামে হিযবুত তাহরীর বা ছাত্রীসংস্থার রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আনা হয়েছে, যা একেবারেই ভিত্তিহীন। তিনি বলেন, কেবল ছালাত আদায়ের কারণেই আমার মেয়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছে। এর মাধ্যমে তার ও তার মেয়ের মর্যাদা সামাজিকভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে'।

কেবল ইসলামী বই, ইসলামী পোষাক ও শরী'আত পালনের কারণে নয়, বরং ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ও রেষারেষির কারণেও সরকার দলীয়রা এটা করে যাচ্ছে এবং ফ্রি স্টাইলে যাকে-তাকে জঙ্গী ও জঙ্গীদলের সদস্য বানাচ্ছে। আর তাদের লাই দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। অথচ এর ফলে তাঁরা তাদের অবাঞ্ছিত দলগুলির জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থাও কমবেশী একই রূপ। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় সবার। এখানে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার সবার। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ছাত্র-ছাত্রী জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে যেকোন বই বা পত্রিকা পড়বে, সকল ধর্মের ছাত্র-ছাত্রী স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করবে, এতে বাধা দেওয়ার অধিকার কারু নেই। দেশের সংবিধানেও সেকথা লেখা আছে। এইসব বিদ্বানরা ভুলে গেছেন যে, যুক্তিকে যুক্তি দিয়ে মোকাবেলা করতে হয়, শক্তি দিয়ে নয়। আদর্শকে আদর্শ দিয়েই মোকাবিলা করতে হয়, অন্য কিছু দিয়ে নয়। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা ও অশান্তিই কেবল বৃদ্ধি পাবে। এটি আদৌ কোন প্রশাসনিক বিজ্ঞতা ও দক্ষতার পরিচায়ক নয়।

ভাবতেও অবাক লাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ছাত্র ও শিক্ষক নেতৃবৃন্দ কত বড় অদূরদর্শী হ'লে তারা একটি মুসলিম দেশে বসে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন! রাজনৈতিক দলবাজি তাদেরকে কত নীচে নিয়ে গেছে ও তাদেরকে কিরূপ অন্ধ বানিয়েছে, এগুলিই তার প্রমাণ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট করে দিচ্ছে এইসব নোংরা দলবাজি। অতএব সর্বাগ্রে শিক্ষক ও ছাত্রদের রাজনৈতিক দলবাজি বন্ধ করতে হবে। সেইসাথে ইসলাম বিদ্বেষী সকল অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। এটা না করে পরিবেশ শান্ত ও সুন্দর করার আশা করা পচা বিড়াল রেখে কূয়ার পানি সেচার মত হবে। আর সেটা করার দায়িত্ব প্রধানতঃ সরকারের। অতএব কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের দায়ী করলে চলবে না, সরকারকেই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। নইলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা ধ্বংস হবে এবং সেই সাথে ধ্বংস হবে সমাজ ও রাষ্ট্র। আল্লাহ আমাদের সুপথ প্রদর্শন করুন- আমীন! *(স.স.)*।

উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আহলেহাদীছগণের অগ্রণী ভূমিকা

মূল (উর্দূ) : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি

*অনুবাদ : নূরুল ইসলাম**

এখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উপমহাদেশে আহলেহাদীছগণের অগ্রগণ্য কৃতিত্বের দিকে আসুন!

হিজরী ত্রয়োদশ ও ঈসায়ী উনবিংশ শতক উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের যুগ ছিল। যে সমস্ত ব্যক্তি মুসলমানদের এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দর্শনে চরমভাবে মর্মাহত ও উদ্বিগ্ন হন তাঁদের মধ্যে সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী, মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল দেহলভী ও তাঁদের সম্মানিত সাথীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সৎ ব্যক্তিগণ সংঘবদ্ধভাবে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। দেশের গ্রাম-গঞ্জে ও শহর-নগরে যান। লোকদেরকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করে সুশৃংখলভাবে নিজেদের প্রচেষ্টা শুরু করেন।

জিহাদ আন্দোলনের উদ্দেশ্য :

তাদের একটি সুশৃঙ্খল আন্দোলন ছিল। যার একটা উদ্দেশ্য তো এটা ছিল যে, মুসলমানরা বিদ'আত পরিত্যাগ করবে, পারস্পরিক মেলামেশার সুবাদে তাদের মধ্যে যেসব হিন্দুয়ানী রসম-রেওয়াজ বাসা বেঁধেছিল তা ছেড়ে দিবে। শিরকী কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত হবে এবং ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করবে। ছালাত-ছিয়াম পালন করবে এবং আক্বীদা ও আমলে কুরআন-সুন্নাহ্‌র বিধানাবলীকে পথনির্দেশিকা হিসাবে গ্রহণ করবে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল এই দেশ থেকে ইংরেজদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দূর করা এবং এজন্য যথারীতি জিহাদ করা। এই দু'টি উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক। মূলতঃ এজন্য তাঁরা পূর্ণ প্রচেষ্টা চালান এবং উপমহাদেশে সাড়া ফেলে দেন। এ দেশে দ্বীন পুনর্জীবিতকরণের এটিই ছিল প্রথম নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন। যার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র প্রচার-প্রসার এবং এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে জিহাদের আহ্বান জানিয়ে ভিনদেশী কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা নিজ জন্মভূমিকে বিদায় জানান এবং আরাম-আয়েশের জীবন পরিত্যাগ করে নিজেদেরকে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুছীবতের নিকট সোপর্দ করেন। জিহাদী জোশে পাগলপারা হয়ে ঐ পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ সানন্দে নিজেদের বাড়ি থেকে যাত্রা করেন এবং সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোকে নিজেদের কেন্দ্র নির্বাচন করেন। যেগুলো ইংরেজদের নাগাল ও অমুসলিমদের কর্তৃত্বের বাইরে ছিল।

* *পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১২৪১ হিজরীর ৭ই জুমাদাল আখেরাহ (১৭ই জানুয়ারী ১৮২৬ খ্রিঃ) আমীরুল মুজাহিদীন সাইয়িদ আহমাদ শহীদের নেতৃত্বে পাঁচ/ছয়শো জন মুজাহিদের প্রথম কাফেলা যাত্রা শুরু করে।[১] তাঁদের নিকট নগদ সর্বমোট পাঁচ হাযার রূপী ছিল। যাকে পাথেয় বলা চলে। শিখ সরকারের কারণে পাঞ্জাব অতিক্রম করা কঠিন ছিল। এজন্য তাঁরা রাজস্থান হয়ে সিন্ধুতে পৌঁছেন। সেখান থেকে কান্দাহার অতঃপর কাবুল যান। কাবুল থেকে রওয়ানা হয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রবেশ করেন এবং স্বাধীন গোত্রগুলোকে নিজেদের অবস্থানস্থল হিসাবে বেছে নেন। এরপর উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য মুজাহিদ সেখান পৌঁছতে শুরু করেন।

স্বল্পসংখ্যক মুজাহিদের এই কাফেলা স্বাধীন কেন্দ্রে পদার্পণ করা মাত্রই শিখ সৈন্যরা মুকাবিলার জন্য বের হয়ে আসে এবং যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। এটি ছিল অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা। মূলতঃ নিয়ম-শৃংখলা বজায় রাখা এবং বিজিত এলাকাগুলোকে বিন্যস্ত করার জন্য একটি সুশৃঙ্খল সরকার ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এজন্য ১২৪২ হিজরীর ১২ই জুমাদাল আখেরাহ (১০ই জানুয়ারী ১৮২৭ খ্রিঃ) একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। সাইয়িদ আহমাদ শহীদ এই সরকারের আমীর নিযুক্ত হন। সাইয়িদ ছাহেবের ভারতীয় সাথীগণ ছাড়াও স্থানীয় পাঠানরা তাঁর নিকট বায়'আত করে এবং তাঁর নেতৃত্বে জিহাদে অংশগ্রহণের ঘোষণা দেয়।

সাইয়িদ ছাহেবের সাথীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন আলেম-ওলামা। জিহাদের নেতৃত্বের লাগাম তাঁদের হাতেই ছিল। আলেমগণের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল দেহলভী, মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী, মাওলানা সাইয়িদ আওলাদ হাসান কন্নৌজী, মাওলানা বেলায়াত আলী আযীমাবাদী, মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী রামপুরী অন্যতম। মোটকথা অনেক আলেম ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি এই জামা'আতে শামিল ছিলেন। যারা স্রেফ আল্লাহ্‌র বাণীকে সমুন্নতকরণ এবং দেশ থেকে ইংরেজদের আধিপত্য খতম করার জন্যই ময়দানে নেমেছিলেন। কিন্তু এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, শিখরা তাদের মুকাবিলার জন্য এগিয়ে আসে এবং তাদের সাথে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি কঠিন যুদ্ধ হয়। শেষ মুকাবিলা হয়েছিল বালাকোট ময়দানে। যেখানে ১২৪৬ হিজরীর ২৪শে যিলক্বদ (৬ই মে ১৮৩১ খ্রিঃ) সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল দেহলভী সহ শতশত মুজাহিদ শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন।[২]

১. অগ্রগামী বাহিনী, দক্ষিণ বাহু, বামবাহু, রসদবাহী দল ও মূল বাহিনী সহ পাঁচটি বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক আমীরের দায়িত্বে সোপর্দ করে সাইয়িদ আহমাদের জন্মস্থান অযোধ্যার রায়বেরেলীর 'তাকিয়া' গ্রাম হতে মুজাহিদ বাহিনী আল্লাহ্‌র নামে রওয়ানা হয়। *দ্রঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন (পিএইচ.ডি থিসিস), পৃঃ ২৬৩।-অনুবাদক।*

২. এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে প্রায় ৩০০ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন এবং ৭০০ শিখ সৈন্য নিহত হয়। *দ্রঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ২৮৪।-অনুবাদক।*

Contents

যাহোক শিখ বা ইংরেজ যাদের সাথেই লড়াই হোক তাতে কোন যায় আসে না। দু'টি দলই মুসলমানদের শত্রু ছিল এবং উভয়েরই লক্ষ্য ছিল মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। বালাকোট যুদ্ধের পর মুজাহিদগণ যথারীতি ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হন। মুজাহিদগণের এই আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক ও নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন ছিল। প্রায় সোয়াশো বছর ব্যাপী (১৮২৬-১৯৪৭ খ্রিঃ) যেটি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিল এবং অবশেষে সেই শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দেয়।

শাহ আব্দুল আযীয-এর ফৎওয়া :

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) কর্তৃক ইংরেজদের বিরুদ্ধে জারীকৃত ফৎওয়াই ছিল জিহাদ আন্দোলনের ভিত্তি। ফৎওয়াটি ফার্সী ভাষায় জারী করা হয়েছিল। যার অনুবাদ নিম্নরূপ- 'এখানে খ্রিস্টান নেতাদের (খ্রিস্টান শাসকদের) হুকুম নির্দ্বিধায় জারী আছে। আর তাদের হুকুম জারী ও কার্যকরী হওয়ার মানে হল রাষ্ট্র পরিচালনা, প্রজা পালন, খারাজ ও কর, ওশর ও ভূমিকর, ব্যবসায়িক সম্পদ, চোর-ডাকাতদের মামলা-মোকদ্দমার বিচার এবং অপরাধ সমূহের শাস্তি প্রদানে এই লোকেরা (খ্রিস্টানরা) নিজেরাই হাকিম (বিচারক) ও একচ্ছত্র অধিপতি। জুম'আর ছালাত, ঈদায়েন, আযান এবং গাভী যবেহ ইত্যাদি বিধি-বিধানে তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না বটে, কিন্তু যে জিনিসটা এ সকল কিছুর মূল এবং স্বাধীনতার ভিত্তি তা নিশ্চিতভাবে ভূলণ্ঠিত ও পদদলিত। এরা নির্বিচারে মসজিদগুলিকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। জনসাধারণের নাগরিক স্বাধীনতা শেষ হয়ে গেছে। এমনকি কোন মুসলিম বা অমুসলিম তাদের অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত এই শহর (দিল্লী) বা এর আশপাশে আসতে পারে না। সাধারণ মুসাফির বা ব্যবসায়ীদের শহরে যাতায়াতের যে অনুমতি রয়েছে সেটিও দেশীয় স্বার্থ বা জনসাধারণের নাগরিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে নয়; বরং তাদের নিজেদের স্বার্থে। পক্ষান্তরে বিশিষ্ট ও খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ তাদের অনুমতি ব্যতীত এই দেশে প্রবেশ করতে পারে না। দিল্লী থেকে কলকাতা অবধি তাদেরই কর্তৃত্ব চলছে। অবশ্য কিছু ডানে-বামে যেমন হায়দারাবাদ, লাক্ষ্ণৌ ও রামপুরের শাসকদের ইংরেজদের আনুগত্য স্বীকার করা মানে যথারীতি খ্রিস্টানদের শাসন জারী হওয়া নয়'।[৩]

এটা ছাড়াও শাহ আব্দুল আযীয আরেকটি ফৎওয়া জারী করেছিলেন। যেটিতে দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে, ভারতবর্ষ বর্তমানে 'দারুল হারব' বা যুদ্ধ এলাকা হয়ে গেছে।[৪]

বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ দু'টি ফৎওয়াই সুস্পষ্ট। এর আলোকে নিঃসন্দেহে ঐ সময় ভারতবর্ষ 'দারুল হারব' ছিল এবং এর স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের সাথে জিহাদ করা আবশ্যক ছিল। মূলতঃ মাওলানা ইসমাঈল দেহলভী, সাইয়িদ আহমাদ শহীদ এবং তাঁদের সাথীগণ ইংরেজদের সাথে জিহাদের সূচনা করেছিলেন। অতঃপর কোন না কোনভাবে এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকতে থাকতে ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার নে'মত লাভ সহজসাধ্য হয়। মুজাহিদগণের এই আন্দোলনকে 'ওহাবী আন্দোলন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেটি ১২১ বছর যাবৎ চলমান ছিল।

বাংলার ফারায়েযী আন্দোলন :

সাইয়িদ আহমাদ শহীদ ব্রেলভীর আন্দোলনের কয়েক বছর পূর্বে 'ফারায়েযী' নামে বাংলাদেশে একটি জামা'আত বা দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাওলানা শরীয়তুল্লাহ। যিনি ফরীদপুর যেলার বাহাদুরপুরের বাশিন্দা ছিলেন। তিনি ১৮ বছর বয়সে হজ্জ পালন করতে যান এবং ২০ বছর মক্কা মু'আযযামায় অবস্থান করে শায়খ তাহের মাক্কী শাফেঈর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। ১৮০২ সালে তিনি ভারতে আসেন। ১৮০৪ সালে তিনি 'ফারায়েযী জামা'আত' নামে বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন এবং মন্দ রসম-রেওয়াজ ও বিদ'আত উৎখাতের আন্দোলন শুরু করেন। মাওলানা শরীয়তুল্লাহ প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তাঁর আন্দোলনও জিহাদ আন্দোলনের ন্যায় ওহাবী আন্দোলন-এর নামে পরিচিত হয়। ফারায়েযী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা বিশেষভাবে কৃষক ও বর্গাচাষীদের মধ্যে অনেক কাজ করেন। তিনি 'পীর-মুরীদ' এর পরিবর্তে 'উস্তাদ-শাগরেদ' শব্দগুলি ব্যবহার করতেন। তাঁর শ্লোগান ছিল اَلْاَرْضُ لِلّٰهِ ভূমি আল্লাহ্‌র এবং যে ব্যক্তি জমিতে কাজ করে, সেই তার মালিক। ১৮৪০ সালে মাওলানা শরীয়তুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলে হাজী মুহসিন মিয়াঁ ফারায়েযী আন্দোলনের নেতৃত্ব সামলান। বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমানেরা তাঁকে আদর করে 'দুদু মিয়াঁ' বলে ডাকত। পিতার মতো তিনিও উদ্যমী ও সক্রিয় কর্মী ছিলেন। বাংলাদেশ থেকে ইংরেজদের উৎখাত করাও ফারায়েযী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য তারা বহু ত্যাগ স্বীকার করেন এবং ইংরেজদের হাতে অনেক নির্যাতন সহ্য করেন।

নিছার আলী ওরফে তিতুমীর :

সাইয়িদ আহমাদ শহীদ ব্রেলভী ও মাওলানা ইসমাঈল শহীদ দেহলভী যেই সময় স্বাধীন গোত্রগুলোতে জিহাদী কর্মকাণ্ডে নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময়ে বাংলায় নিছার আলী নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। যিনি 'তিতুমীর' নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি কৃষক ছিলেন। এক জমিদার বাড়িতে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তিনি সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভীর শিষ্য ছিলেন। তিতুমীর ছিলেন কৃষকদের রক্ষক। হাযার হাযার কৃষক তাঁর সাথে ছিল। যারা হিন্দু জমিদারদের যুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ফারায়েযী আন্দোলন ছিল বাংলার মুসলমানদের প্রথম আন্দোলন। ওখানকার অবস্থা অনুযায়ী ঐ

---

৩. ফাতাওয়া আযীযিয়া ১/১৭।
৪. ঐ ১/১০৫।

সময়ের আহলেহাদীছ আলেমগণ একটি সুনির্দিষ্ট চিন্তার আলোকে যার গোড়াপত্তন করেছিলেন।

১৮৩১ সালে কৃষ্ণরায় নামে পূর্ণিয়ার এক জমিদারের কথা লোক জানতে পারে। তিনি এই যুলুম করেন যে, তার প্রত্যেক মুসলিম কৃষকের উপর, যাকে তিনি ওহাবী বলতেন, আড়াই টাকা ট্যাক্স ধার্য করতেন। তিনি এটাকে 'দাড়ির ট্যাক্স' হিসাবে আদায় করে মুসলমানদের ক্রোধাগ্নি জ্বালিয়ে দেন।[৫] নিজ গ্রামে বিনা বাধায় তিনি এই ট্যাক্স আদায় করে নেন। কিন্তু যখন তার কর্মচারীরা নিকটবর্তী গ্রাম সরফরাজপুরে পৌঁছে তখন ঘটনাচক্রে সেখানে নিছার আলী তিতুমীর স্বীয় ভক্তদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কৃষ্ণরায়ের কর্মচারীদেরকে গ্রেফতার করেন। অতঃপর উভয় পক্ষের মধ্যে কঠিন সংঘর্ষ হয় এবং ঘটনা নিহত হওয়া পর্যন্ত গড়ায়। এতে তিতুমীর ও তাঁর অনেক সাথী শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন।[৬]

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে আহলেহাদীছ আলেমদের অবদান :

১৮৫৭ সালের (১২৭৩ হিঃ) স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে তাতেও আহলেহাদীছগণ অংশগ্রহণ করেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য জারী করা ফৎওয়ায় মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভী স্বাক্ষর করেছিলেন।[৭] ফৎওয়া জারির কিছুদিন পর মিয়াঁ ছাহেবকে দিল্লী থেকে গ্রেফতার করে সেখান থেকে ১২/১৩ শত কিলোমিটার দূরে রাওয়ালপিণ্ডি জেলে বন্দী করা হয়। মিয়াঁ ছাহেব ১ বছর কারাবন্দী থাকেন।[৮] এই যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয় হলে তারা অসংখ্য মুসলমানকে গ্রেফতার করে ফাঁসি প্রদান করে অথবা লবণাক্ত সমুদ্র পার হওয়ার শাস্তি দেয় অর্থাৎ কালাপানিতে নির্বাসন দেয়। এদের মধ্যে অনেক ওহাবী ছিল।

এরপর ওহাবীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা সমূহ দায়ের করা হয়। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে যেগুলোকে 'ওহাবী মোকদ্দমা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আম্বালা, আযীমাবাদ (পাটনা), মালদহ, রাজমহল প্রভৃতি স্থানে আহলেহাদীছ আলেম-ওলামা ও নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মোট ৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সংক্ষেপে ঐ সমস্ত মামলার বিবরণ নিম্নরূপ :

১. আম্বালার প্রথম বিদ্রোহ মামলা :

আম্বালায় শুরু হওয়ার কারণে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই মোকদ্দমাটিকে 'আম্বালা মোকদ্দমা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এটি ছিল প্রথম রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা। মামলার প্রাথমিক কার্যক্রম ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন টাই-এর আদালতে শুরু হয়েছিল। যেটি এক সপ্তাহ অব্যাহত

---

৫. তিতুমীরের সহযোদ্ধা সাজন গাযী 'তিতুমীরের গান'-এ এদিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, 'নামাজ পড়ে দিবারাতি/কি তোমার করিল খেতি/কেনে কল্লে দাড়ির জরিমানা'। উদ্ধৃত : *দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্মৃত ইতিহাস, ২য় খণ্ড (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৭), পৃঃ ৮৯।-অনুবাদক।*

৬. ১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর সঙ্গী-সাথীসহ নিছার আলী তিতুমীর নারিকেলবাড়িয়ার ঐতিহাসিক 'বাঁশের কেল্লা'-র যুদ্ধে ছালাতরত অবস্থায় শাহাদাতবরণ করেন। সেনাপতি গোলাম মা'ছূমসহ বাকী সাড়ে তিনশত সাথী গ্রেফতার বরণ করেন *(দ্রঃ গোলাম রাসূল মেহের, সারগুযাশতে মুজাহিদীন, পৃঃ ২০৪-২০৮; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪১৮)*। ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান ব্রিটিশ সূত্রের আলোকে উল্লেখ করেছেন যে, এদের মধ্যে ৩৩৩ জনকে ১৮৩৩ সালের ২২শে নভেম্বরে আলীপুর জেল সুপারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। অবশিষ্ট ১৭ বা ২০ জনকে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে নদীপথে পাঠানো হয়। বন্দীদের মধ্যে ১৯৭ জনকে ৫টি মামলায় জড়ানো হয়। এদের মধ্যে ৪ জন বিচারকার্য শুরু হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। উন্মাদ অবস্থায় ১ জনকে মুক্তি দেয়া হয়। তাছাড়া কমিটি ৩ জনকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে। মোট ১৮৯ জন বন্দীর বিচার কোর্ট সমাধা করে। এদের মধ্যে ৪৯ জনকে কোর্ট নির্দোষ এবং অবশিষ্ট ১৪০ জনকে অপরাধী সাব্যস্ত করে। ১৪০ জনের মধ্যে তিতুমীরের প্রধান সেনাপতি গোলাম মা'ছূমকে (৩০) মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর অন্যদের জন্য সতর্কবার্তা হিসাবে তাঁর লাশ নারিকেলবাড়িয়ায় ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। তাছাড়া অন্য ৩ জনকে অপরাধী সাব্যস্ত করলেও কোন সাজা প্রদান করা হয়নি। অবশিষ্ট ১৩৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে ১১ জনকে যাবজ্জীবন, ৯ জনকে ৭ বছর কারাদণ্ড, ৯ জনকে ৬ বছর, ১৬ জনকে ৫ বছর, ৩৫ জনকে ৪ বছর, ৩৪ জনকে ৩ বছর এবং ২২ জনকে (সর্বমোট ১৩৬) ২ বছর কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। *দ্রঃ ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, ব্রিটিশ ভারতীয় নথিতে তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীগণ (Titumir and his followers in British Indian Records) অনুবাদ : ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯), পৃঃ ৩৬-৩৮।-অনুবাদক।*

৭. ১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে জিহাদ আখ্যা দিয়ে যে ফৎওয়া জারী করা হয়েছিল তাতে মোট ১৪ জন আলেম স্বাক্ষর করেছিলেন। এদের মধ্যে মিয়াঁ ছাহেবের নাম ছিল সর্বাগ্রে। ঐ আলেমগণের তালিকা 'যাফরুল আখবার' ও 'ছাদিকুল আখবার' নামে তদানীন্তন দু'টি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া ১৮৫৭'র মহাবিপ্লবের ঝাণ্ডাবাহী জেনারেল বখত খাঁও আহলেহাদীছ ছিলেন। *দ্রঃ আব্দুর রশীদ ইরাকী, হায়াতে নাযীর (লাহোর : নাশরিয়াত, ২০০৭), পৃঃ ৬৬।-অনুবাদক।*

৮. মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর বিরুদ্ধে বিরোধীরা ইংরেজ সরকারের নিকট অভিযোগ করে যে, তাঁর নিকটে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পত্র আসে। এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাঁর বাড়ি তল্লাশি করা হলে অনেক পত্র পাওয়া যায়। যেগুলো কোন মাসআলা জানার জন্য বা ধর্মীয় পুস্তকের সন্ধান জানার জন্য তাঁর নিকটে প্রেরিত হয়েছিল। মিয়াঁ ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার নিকটে এত পত্র আসে কেন? তিনি নির্দ্বিধায় জবাব দেন, এই প্রশ্ন পত্র প্রেরকদেরকে করা উচিত, আমাকে নয়? উদ্ধারকৃত পত্রগুলির মাঝে একটিতে লেখা ছিল, 'নুখবাতুল ফিকার' (نخبة الفكر) পাঠাবেন। গোয়েন্দা বলে যে, এটি একটি বিশেষ পরিভাষা। যার মর্ম অন্য কিছু। এরা পত্রে পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে। মিয়াঁ ছাহেব এই কথা শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন, নুখবাতুল ফিকার কি কামান, বন্দুক, না গোলা-বারুদ? অতঃপর তিনি ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেন, জনাব আপনি আমার মামলা কোন মূর্খের সামনে পেশ করেছেন। আপনি আপনার কোন ইউরোপীয় বা দেশীয় আলেমকে জিজ্ঞেস করুন যে, 'নুখবাতুল ফিকার' কোন বইয়ের নাম কি-না? এরপর তাকে দিল্লী থেকে রাওয়ালপিণ্ডি নিয়ে যাওয়া যায়। সেখানকার জেলে তিনি এক বছর বন্দী থাকেন। জেলখানায় বন্দী থাকা অবস্থায় মিয়াঁ ছাহেব সরকারী লাইব্রেরী থেকে বইপত্র পড়ার অনুমতি নেন। অধ্যয়নেই তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটত। মিয়াঁ ছাহেবকে ফাঁসানোর অনেক চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ হাযির করতে না পেরে ১ বছর পর তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়। *দ্রঃ হায়াতে নাযীর, পৃঃ ৬৩-৬৫; মাওলানা ফযল হুসাইন, আল-হায়াত বা'দাল মামাত (দিল্লী : আল-কিতাব ইন্টারন্যাশনাল, ২০০৪), পৃঃ ৯৮-৯৯।-অনুবাদক।*

ছিল। এই সময়ে অভিযোগের ধরণ, সাক্ষীদের বিন্যস্তকরণ এবং সাক্ষ্যসমূহের বিস্তারিত বিবরণ একত্রিত করে সব অভিযুক্তকে সেশন কোর্টে সোপর্দ করে দেয়া হয়। যথারীতি সেশন আদালতে মামলা শুরু হয়। এরা ১১ জন আসামী ছিলেন। যাদের নাম পরে উল্লেখ করা হবে।

প্রথম দিন ডেপুটি কমিশনারের আদালতে অভিযুক্তদের হাযির করা হলে মোকদ্দমা চলাকালীন ছালাতের সময় হয়ে যায়। ছালাত আদায়ের অনুমতি চাইলে অনুমতি মিলেনি। অতঃপর এই রীতি হয়ে দাঁড়ায় যে, যখনই ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে যেত তখনই অভিযুক্তরা তায়াম্মুম করে বসে ইশারায় ছালাত আদায় করে নিতেন। ডেপুটি কমিশনারের আদালতে যতদিন মামলার শুনানি চলে ততদিন প্রত্যেক আসামী পৃথক পৃথক ফাঁসির কক্ষে বন্দী থাকেন। যখন মামলা সেশন কোর্টে স্থানান্তরিত হয় তখন সবাইকে জেলখানায় এক জায়গায় রাখা হয়। এখানে পরিবেশ কিছুটা অনুকূলে ছিল এবং সবাই একত্রে থাকতেন। এজন্য কষ্টের অনুভূতি প্রায় দূর হয়ে গিয়েছিল। ঐ দিনগুলিতে মাওলানা মুহাম্মাদ জা'ফর থানেশ্বরী প্রায়শই এই ফার্সী কবিতা পাঠ করতেন,

پائے در زنجیر پیش دوستاں * بہ کہ بہ بیگا نگاں دربوستاں

'বন্ধুদের সাথে পায়ে যিঞ্জীর পরিহিত থাকা অপরিচিতদের সাথে বাগিচায় থাকার চেয়েও উত্তম'।

মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী কষ্টের সেই দিনগুলিতে সাধারণভাবে এই চতুষ্পদী কবিতা পড়তেন এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতেন-

لَسْتُ أُبَالِيْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا + عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِيْ

وَذَلِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِلٰهِ وَإِنْ يَشَأْ + يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

'আমি যখন মুসলিম হিসাবে নিহত হই তখন আমি কোন পরোয়া করি না যে, আমাকে কোন্ পার্শ্বে শোয়ানো হচ্ছে'। 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই আমার মৃত্যু হচ্ছে। তিনি ইচ্ছা করলে আমার খণ্ডিত টুকরা সমূহে বরকত দান করতে পারেন'।[৯]

অপরাধীদের নাম ও রায় :

আমরা এখানে এই মামলার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করতে চাচ্ছি না। এখানে শুধু এটা বলা উদ্দেশ্য যে, সেশন জজের আদালতে মামলা চলে। কতিপয় আসামী বড় অংকের ফিস দিয়ে ইংরেজ উকিলদের সহায়তা নেন। কিন্তু আদালত ১৮৬৪ সালের ২রা মে নিম্নোক্ত আসামীদেরকে নিম্নলিখিত রায় শুনায় :

১. **শেখ মুহাম্মাদ শফী :** মৃত্যুদণ্ড, সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত, জেলের কবরস্থানে লাশ দাফন করা হবে।

২. **মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী ছাদেকপুরী :** একই সাজা।

৩. **মাওলানা মুহাম্মাদ জা'ফর থানেশ্বরী :** মৃত্যুদণ্ড, সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত।

৪. **মাওলানা আব্দুর রহীম ছাদেকপুরী :** কালাপানিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত।

৫. **কাযী মিয়াঁজান**[১০] **:** একই সাজা।

৬. **আব্দুল গাফফার ছাদেকপুরী :** একই সাজা।

৭. **মুনশী আব্দুল করীম :** একই সাজা।

৮. **এলাহী বখশ :** একই সাজা।

৯. **আব্দুল গফুর :** একই সাজা।

১০. **হুসায়নী আযীমাবাদী :** একই সাজা।

১১. **হুসায়নী থানেশ্বরী :** একই সাজা।

সাজা শোনার পর আসামীদের ইংরেজ এ্যাডভোকেটগণ পাঞ্জাব জুডিশিয়াল কমিশনারের আদালতে আপিল করেন। যার ফলে সাজা কিছুটা হাল্কা হয় এবং প্রথম তিন আসামীর মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সহ কালাপানিতে নির্বাসনে রূপান্তরিত করা হয়। ১৮৬৪ সালের ২৪শে আগস্ট এই রায় দেয়া হয়। যে তিনজন বুযুর্গের ফাঁসির সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তিত হয় তার সংবাদ তারা ১৮৬৪ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর অবগত হন।

যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে যে, শেখ মুহাম্মাদ শফী, মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী এবং মাওলানা মুহাম্মাদ জা'ফরকে (তিনজন) ফাঁসির সাজা শুনানো হয়েছিল। এখানে এ ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে, মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী ও মাওলানা মুহাম্মাদ জা'ফর থানেশ্বরী সাজা শুনে দারুণ খুশি ছিলেন। ইংরেজ পুলিশ অফিসার মাওলানা মুহাম্মাদ জা'ফরকে এই খুশির কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, 'শাহাদাতের আকাঙ্খায় খুশি হয়েছি। যেটি মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় নে'মত। তুমি এর মর্ম কী বুঝবে'?[১১]

এরপর তাঁদের মৃত্যুদণ্ড বাতিল করা হয়। কারণ এতে আসামীরা আনন্দ অনুভব করছিল। আর তাদেরকে খুশি করা কস্মিনকালেও উদ্দেশ্য ছিল না।[১২] এর পরিবর্তে কালাপানিতে নির্বাসন সহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। কারণ মৃত্যুর পরিবর্তে এটি বেশি কষ্টদায়ক শাস্তি হবে। শেখ মুহাম্মাদ শফীর সাজা শুধু সম্পত্তি বাযেয়াফ্তকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। মৃত্যুদণ্ড বাতিল করে যাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

---

৯. *সীরাত ইবনে হিশাম ২/১৭৬; বুখারী হা/৩৯৮৯।*

১০. ব্যাপক ওহাবী ধরপাকড়ের সময় যে পাঁচজন সেরা মুজাহিদ আমৃত্যু সকল নির্যাতনের মুখে হিমাদ্রির ন্যায় অবিচল ছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন কুষ্টিয়া যেলার কুমারখালীর দুর্গাপুর কাযীপাড়ার বীর সন্তান কাযী মিয়াঁজান। ১২৮১ হিঃ মোতাবেক ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে পাঞ্জাবের আম্বালা জেলখানায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। *দ্রঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪২২।-অনুবাদক।*

১১. *মাওলানা মুহাম্মাদ জা'ফর থানেশ্বরী, কালাপানি, পৃঃ ৬৮।*

১২. যেমন হান্টার বলেছেন, মুজাহিদগণকে শাহাদাতের অমৃতসুধা হতে বঞ্চিত করার জন্য কারাদণ্ড ও দ্বীপান্তর ছিল ইংরেজ বিচারকদের একটি সূক্ষ্ম পলিসি। যাতে তারা জিহাদে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। *দ্রঃ দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস (বঙ্গানুবাদ), পৃঃ ৮৩; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪১২।-অনুবাদক।*

সহ কালাপানিতে নির্বাসনের সাজা দেয়া হয়েছিল তাদের মাথা ও দাড়ি-মোচ কামিয়ে দেয়া হয়েছিল। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী কর্তিত দাড়ি হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বলতেন, 'দুঃখ করিস না। তোকে আল্লাহ্র রাস্তায় গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এজন্যই কর্তন করা হয়েছে'।[১৩]

কালাপানিতে যাত্রা :

উপরোক্ত ১১জন আসামীর মধ্যে চারজন মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী, মিয়াঁ আব্দুল গাফফার, মাওলানা মুহাম্মাদ জা'ফর থানেশ্বরী এবং মাওলানা আব্দুর রহীমকে কালাপানিতে পাঠানো হয়েছিল। প্রথম তিনজন বুযুর্গকে হাতকড়া ও বেড়ি পরিয়ে পায়ে হাটিয়ে আম্বালা থেকে লুধিয়ানা, ফলওয়ার, জলন্ধর ও অমৃতসর হয়ে লাহোর নিয়ে যাওয়া হয় এবং কিছুদিন লাহোর কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়। এরপর ট্রেন যোগে মুলতান এবং সেখান থেকে নৌকায় আরোহণ করিয়ে কোটরী পৌঁছানো হয়। কোটরী থেকে করাচী এবং করাচী থেকে পাল তোলা নৌকায় করে মুম্বাই পৌঁছে। ১৮৬৪ সালের ৮ই ডিসেম্বর জমুনা সামুদ্রিক জাহাযে মুম্বাই থেকে যাত্রা করে ৩৪ দিন পর ১৮৬৫ সালের ১১ই জানুয়ারী পোর্ট ব্লেয়ারে (আন্দামান দ্বীপ) অবতরণ করে।[১৪]

এর কিছুদিন পর মাওলানা আব্দুর রহীমকে আম্বালা জেল থেকে বের করা হয়। তিনি অসুস্থ ছিলেন। লাহোর পৌঁছার পর ১ বছর ৮ মাস লাহোর কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকেন। এরপর মুলতান, কোটরী, করাচী ও মুম্বাই হয়ে কালাপানি পৌঁছেন। তাঁর এই সফর খুবই কষ্টদায়ক ছিল। এর একটা কারণ তো এটা ছিল যে, তিনি নিজে অসুস্থ ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ ছিল যে জাহাযে তিনি যাত্রী ছিলেন, তার সকল যাত্রী বিভিন্ন অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস আঘাত হেনেছিল। যার কারণে জাহাযটি ২৩ দিনের পরিবর্তে ১ মাস ২১ দিনে পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছেছিল।

২. আযীমাবাদের প্রথম বিদ্রোহ মামলা :

মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী প্রমুখের মামলার রায় হওয়ার পর-যেটি আসলে প্রথম বিদ্রোহ মামলা ছিল- আযীমাবাদে (পাটনা) মাওলানা আহমাদুল্লাহ্র বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ধারাবাহিকতার দিক থেকে এটি দ্বিতীয় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা ছিল। কিন্তু আযীমাবাদের (পাটনা) দু'টি মামলার মধ্যে প্রথম ছিল।

নিজের জ্ঞান-গরিমা, তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা, ইবাদত-বন্দেগী এবং বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার কারণে মাওলানা আহমাদুল্লাহ আযীমাবাদ ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হতেন। তিনি ছিলেন মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর বড় ভাই, নিজ এলাকার নেতা এবং মৌলবী এলাহী বখশ জা'ফরীর পুত্র। তিনি ১২২৩ হিজরীতে (১৮০৮ খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নাম রেখেছিলেন আহমাদ বখশ। সাইয়িদ আহমাদ শহীদের সাথে জড়িত হলে তিনি তাঁর নাম রাখেন আহমাদুল্লাহ। অতঃপর এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী ও অন্যান্য শিক্ষকগণের নিকট দ্বীনী ইলম শিক্ষা করেন। ১৮৫৭ সালের গণ্ডগোলের সময় প্রায় তিন মাস সার্কিট হাউসে নযরবন্দী থাকেন।

আযীমাবাদের এই গোটা পরিবারকে ইংরেজ সরকার বিপদের সম্মুখীন করেছিল এবং পরিবারের সব সদস্যের বিরুদ্ধে অনেক মামলা দায়ের করা হয়েছিল। মাওলানা আহমাদুল্লাহ্র ছেলে হাকীম আব্দুল হামীদ 'শাহরে আশূব' (গণ্ডগোলের মাস) নামে ফার্সীতে একটি মছনবী লিখেছিলেন। যেখানে ঐ সকল কষ্ট-পরীক্ষার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছিলেন। এই মছনবীতে মাওলানা আহমাদুল্লাহ্র ছোট ভাই মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর উক্ত সাজার কথাও মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন। ১ বছর পূর্বে যে সাজা আম্বালায় প্রদান করা হয়েছিল।

১২৮১ হিজরীর ২৯শে রামাযানে (২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬৫ খ্রিঃ) মাওলানা আহমাদুল্লাহ্র সাজার হুকুম জারী করা হয়েছিল। প্রথমে সম্পত্তি বাযেয়াফ্তকরণ ও ফাঁসির সাজা শুনানো হয়েছিল। পরে এটাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সহ কালিপানিতে নির্বাসনে রূপান্তরিত করা হয়। ফাঁসির দণ্ডাদেশে মাওলানা মোটেই বিচলিত হননি। ছোট ভাই মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর মতোই তিনিও সাজা শুনে আনন্দিত ও প্রফুল্ল ছিলেন।

সম্পত্তি বাযেয়াফ্তকরণ ও নিলাম :

সম্পত্তি বাযেয়াফ্তকরণ ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশের কারণে তাঁদের কোন চিন্তা ছিল না। এ জাতীয় সকল কষ্ট তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে সহ্য করতে পারতেন। আসল চিন্তা ও কষ্ট ছিল পরিবার-পরিজনকে নিয়ে। সম্পত্তি বাযেয়াফ্তকরণের কারণে যারা বাস্তুহারা হয়ে গিয়েছিলেন এবং মাথা গোঁজার কোন ঠাঁই তাদের ছিল না। দিন গুযরানের ছিল না কোন ব্যবস্থা। তাঁদের অস্থাবর সম্পত্তি নিলামের প্রশ্ন সামনে আসলে আযীমাবাদের (পাটনা) মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধভাবে উক্ত ডাকে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেন। সেজন্য প্রতিশোধ পরায়ণতায় উন্মত্ত হয়ে ইংরেজরা লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদকে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দেয়। নিলামের ৭৭ বছর পর ১৯৩৫ সালে ইন্ডিয়া এ্যাক্টের অধীনে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে বিহার প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠন করলে ১৯৩৯ সালে হাজীপুর নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মিঃ বদরুল হাসান বিহার এ্যাসেম্বেলীতে ঐ সম্পদের মূল্য ও নিলাম সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে সরকারের একজন মন্ত্রী ঐ স্থাবর

১৩. *কালাপানি, পৃঃ ৬৮।*

১৪. উপরোক্ত বর্ণনায় ১৮৬৪ সনের স্থলে ১৮৬৫ এবং ১৮৬৫ সনের স্থলে ১৮৬৬ হবে। *দ্রঃ ড. কিয়ামুদ্দীন আহমাদ, হিন্দুস্তান মেঁ ওয়াহাবী তাহরীক (The Wahabi Movement in India), উর্দূ অনুবাদ : প্রফেসর মুহাম্মাদ মুসলিম আযীমাবাদী (করাচী, পাকিস্তান: নাফীস একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮০), পৃঃ ২৭৪; Ritu Chaturvedi and S.R. Bakshi, Bihar through the Ages, Vol. 3 (New Delhi : Sarup & sons, 2007), p. 313.-অনুবাদক।*

ও অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন। যা ১২৮১ হিজরীর রামাযান মাসে (ফেব্রুয়ারী ১৮৬৫ খ্রিঃ) ইংরেজরা বাযেয়াফ্ত করেছিল।

এখানে এটা খোলাছা করা আবশ্যক যে, অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে ঐ তিন ভাইয়ের (মাওলানা আব্দুর রহীম, মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী ও মাওলানা আহমাদুল্লাহ) বইপত্র, আসবাবপত্র, ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়া, পালকি, অলংকার প্রভৃতি বহু মূল্যবান সামগ্রী শামিল ছিল। যেগুলো খুবই কম মূল্যে নিলাম হয়েছিল।

এরপর তাঁদের বাড়ি-ঘর গুঁড়িয়ে দিয়ে তাদের মহল্লা ছাদেকপুরকে আযীমাবাদ (পাটনা) পৌরসভা কমিটিকে দিয়ে দেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ঐ স্থানও অন্তর্ভুক্ত ছিল যাকে 'কাফেলা' বলা হত। সেটিকে এজন্য 'কাফেলা' বলা হত যে, ওখানে মুজাহিদগণ এবং ঐ জামা'আতের সদস্যগণ অবস্থান করতেন। এই পুরো জায়গায় পাটনা পৌরসভা কমিটির ভবন নির্মিত হয়।[১৫]

নারী ও শিশুদের সঙ্গীন অবস্থা :

মাওলানা আহমাদুল্লাহ্র পরিবার-পরিজনকে ঈদের দিন তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়। নারী-শিশু নির্বিশেষে সবাই অত্যন্ত পেরেশানীর মধ্যে ছিল। থাকার জন্য ছিল না কোন স্থান এবং ব্যবহারের জন্য ছিল না কোন আসবাবপত্র। একটি সুখী পরিবার চরম অসহায়ত্বের শিকার হয়ে গিয়েছিল। মাওলানা আহমাদুল্লাহ্র ছেলে হাকীম আব্দুল হামীদ- যিনি অত্যন্ত যোগ্য আলেম ও কবি ছিলেন, 'শাহরে আশূব' মছনবীতে বিস্তারিতভাবে এটি উল্লেখ করেছেন।

উক্ত মছনবীর কতিপয় পংক্তির অনুবাদ নিম্নরূপ :

'যখন ঈদের রাত শেষ হল এবং আমাদের পরিবার-পরিজন সকাল বেলায় উপনীত হল, তখন সবাইকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হল। সকল সহায়-সম্পদ বাযেয়াফ্ত ও উজাড় হল। নগদ অর্থ, শস্য, আসবাবপত্র, কৃষিক্ষেত সবকিছু নিঃশেষ হয়ে গেল। আমাদের জন্য আহ্ বলাটাও কঠিন অপরাধ ছিল। আসবাবপত্রের মধ্যে সুঁই পর্যন্ত তুলে নেওয়ার অনুমতি ছিল না। আমি একা ছিলাম না, আমার সাথে অনেক মানুষও ছিল। ছিল নারী-শিশু ও তাদের আর্তনাদ। সরকারের দৃষ্টিতে অপরাধী ছিলেন আহমাদুল্লাহ। কিন্তু নিষ্পাপ শিশুদের কী অপরাধ ছিল? আমাদের জীবনের পুঁজি মৃত্যুর আসবাব হয়ে গিয়েছিল। ... আমাদের ঈদ মুহাররমের চাঁদ হয়ে গিয়েছিল। আমি ছিলাম জীবন্মৃত। আমার জন্য প্রশস্ত যমীন সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল'।

মছনবী লেখক হাকীম আব্দুল হামীদ চিকিৎসা করতেন এবং তাঁর সুন্দর দাওয়াখানা ছিল। সেটাও সরকার ক্রোক করে নিয়েছিল। অর্থাৎ জীবনযাপনের কোন কিছুই তাঁর নিকট অবশিষ্ট রাখেনি। বইপত্র, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি কোন কিছুই তাঁর আয়ত্তে ছিল না। বইপত্র জব্দ করার কারণে তিনি বিশেষ ভাবে অত্যন্ত কষ্ট পান। তিনি বলছেন-

کتب ملت مسلماناں * رفت در دست حرف ناخواناں

'মুসলমানদের ধর্মীয় বইপুস্তক মূর্খ লোকদের হাতে চলে গিয়েছিল'।

মাওলানা আহমাদুল্লাহকে কালিপানিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কখন আযীমাবাদ (পাটনা) থেকে রওয়ানা দেয়া হয়েছিল তার সঠিক তারিখ জানা যায়নি। অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী, মাওলানা আব্দুর রহীম, মাওলানা মুহাম্মাদ জা'ফর থানেশ্বরী এবং মিয়াঁ আব্দুল গাফফারের অনেক পূর্বে ১৮৬৫ সালের ১০ই জুনে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

(ক্রমশঃ)

১৫. ১৮৬৪ সালে বৃটিশ সরকার ছাদিকপুরী পরিবারের উপরে এক আকস্মিক অভিযান চালিয়ে নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার, তাদের সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত করা ছাড়াও সমস্ত ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ভিটা উচ্ছেদ করে সেখানে লাঙল চালানো হয়। মাওলানা ফারহাত হুসাইনসহ ছাদিকপুরী পরিবারের বুযুর্গ ব্যক্তিদের কবরস্থান সমান করে সেখানে হিন্দু হরিজনদের শূকর পোষার আখড়া এবং শহরের পায়খানা ফেলার গাড়ী রাখার জায়গা বানানো হয়। কিছু অংশে মহিলাদের মীনাবাজার বসানো হয়। বাকী অংশে পৌরসভার বিল্ডিংসমূহ নির্মিত হয়েছে। দ্রঃ *আহলেহাদীছ আন্দোলন*, পৃঃ ৩১৪; *'আমীরে জামা'আতের ভারত সফর', আত-তাহরীক, জুলাই '৯৮,* পৃঃ ৫২।-অনুবাদক।

নিয়মিত প্রকাশনার ১৮ বছর << আত-তাহরীক পড়ুন! যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাব নিন!! >>

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৫ উপলক্ষে মাসিক আত-তাহরীক বিগত বছরের ন্যায় এবারও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিতব্য এ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমাহারে বিন্যস্ত করা হবে। উক্ত সংখ্যায় আক্বীদা-আমল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সম্বলিত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩। ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫
মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯,
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

আত-তাহরীকে লিখুন! কলমী জিহাদের গর্বিত সৈনিক হৌন!!

খেয়াল-খুশির অনুসরণ

মূল : শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(শেষ কিস্তি)

খেয়ালখুশির বিরুদ্ধাচরণের উপকারিতা :

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেছেন, أَفْضَلُ الْجِهَادِ جِهَادُ الْهَوَى 'কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদই সর্বোত্তম জিহাদ'।[১৬] সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন, أَشْجَعُ النَّاسِ أَشَدُّهُمْ مِنَ الْهَوَى امْتِنَاعًا، وَمِنَ الْمُحَقَّرَاتِ تُنْتَجُ الْمُوْبِقَاتُ 'কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে যে যত বেশী বিরত থাকতে সক্ষম, সে তত বড় বীর পুরুষ। আর তুচ্ছ সব জিনিস থেকেই বড় বড় ধ্বংসাত্মক জিনিস জন্ম নেয়'।[১৭]

অন্তরের রোগ-ব্যাধির প্রকৃত চিকিৎসা কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতার মধ্যে নিহিত। সাহল বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, هَوَاكَ دَاؤُكَ، فَإِنْ خَالَفْتَهُ فَدَوَاؤُكَ 'তোমার কুপ্রবৃত্তি তোমার রোগ। তুমি যদি তার বিরোধিতা কর তাহ'লে সেটাই তোমার ঔষধ'।[১৮]

১. জান্নাত লাভ :

কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা করে ইসলামী নিয়ম-নীতি অনুযায়ী জীবন-যাপনকারী মানুষ জান্নাত লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَأَمَّا مَن طَغَى، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى- 'অতঃপর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে এবং দুনিয়াবী জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে অবশ্যই জাহান্নাম হবে তার আবাসস্থল। আর যে ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) তার মালিকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করেছে এবং নিজের মনকে কামনা-বাসনা থেকে বিরত রেখেছে, অবশ্যই জান্নাত হবে তার ঠিকানা' *(নাযি'আত ৭৯/৩৭-৪১)*।

সুতরাং যে ব্যক্তি তার মনের সাথে যুদ্ধ করে এবং মনের চাওয়া-পাওয়ার বিরোধিতা করতে গিয়ে ধৈর্য ধারণ করে, সে কিয়ামতের দিন উত্তম প্রতিফল পাবে। জান্নাতে প্রবেশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন হবে তার প্রতিদান। এটা মূলত মনের কামনা-বাসনার বিরোধিতায় ধৈর্য ধারণের প্রতিদান। মহান আল্লাহ বলেন, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا 'তারা যে কঠোর ধৈর্য (সহিষ্ণুতা) প্রদর্শন করেছে তার পুরস্কার হিসাবে তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন' *(দাহর ৭৬/১২)*।

আবু সুলাইমান আদ-দারানী বলেছেন, 'আল্লাহ তাদের ধৈর্যের প্রতিদান স্বরূপ জান্নাত ও রেশমী পোষাক দান করবেন' কথার অর্থ 'তারা যে কামনা-বাসনা থেকে ধৈর্যধারণ করেছিল তার প্রতিদান'।[১৯] জনৈক কবি বলেছেন,

وَآفَةُ الْعَقْلِ الْهَوَى فَمَنْ عَلَا + عَلَى هَوَاهُ عَقْلُهُ فَقَدْ نَجَا

'কুপ্রবৃত্তি বিবেকের জন্য এক মস্তবড় আপদ। সুতরাং যার বিবেক তার কুপ্রবৃত্তির উপর জয়যুক্ত হ'তে পেরেছে সে মুক্তি পেয়েছে'।[২০]

২. হাশর দিবসের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি :

হাশর ময়দানে পার্থিব জীবনের প্রতিফল লাভের জন্য সকল প্রাণী একত্রিত হবে। সেখানে আল্লাহ্র রহমতের ছায়ায় স্থান না পেলে কঠিন দুর্দশায় পড়তে হবে। সেদিন সাত শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ্র রহমতের ছায়া লাভ করবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِى ظِلِّه يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ- 'যেদিন আল্লাহ্র বিশেষ ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তা'আলা সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক (২) এমন যুবক যে আল্লাহ্র ইবাদতে জীবন অতিবাহিত করেছে (৩) এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে (৪) এমন দু'জন ব্যক্তি যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবেসে একত্রিত হয় এবং পৃথক হয় (৫) এমন ব্যক্তি যাকে কোন সুন্দরী ও অভিজাত নারী (ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য) আহ্বান করে, তখন সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি (৬) এমন ব্যক্তি যে গোপনে ছাদাক্বা করে কিন্তু তার বাম হাত জানতে পারে না যে তার ডান হাত কি ব্যয় করে (৭) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রুধারা প্রবাহিত করে'।[২১]

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, 'পাঠক, আপনি যদি ভেবে দেখেন, যে ৭ জনকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের ছায়াতলে সেদিন আশ্রয় দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া

* কামিল, এম.এ; সহকারী শিক্ষক, হরিণাকুণ্ডু সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

১৬. *ইবনু মুফলিহ, আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ ৩/২৫১।*
১৭. *ঐ ৩/২৫১।*
১৮. *তাফসীরে কুরতুবী ১৬/১৪৪।*
১৯. *হিলয়াতুল আওলিয়া ৯/২৬৮।*
২০. *ইবনু আব্দিল বার্র, আল ইসতিযকার ২/৩৬৪।*
২১. *বুখারী হা/১৪২৩; মুসলিম হা/১০৩১।*

ব্যতীত কারো ছায়া থাকবে না তাহ'লে বুঝতে পারবেন যে, সে সাতজনই কিন্তু কুপ্রবৃত্তি ও খেয়ালখুশির বিরুদ্ধাচরণ হেতুই তা লাভ করেছে। কারণ একজন দোর্দন্ত প্রতাপশালী শাসক তার কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ব্যতীত ইনছাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। যে যুবক তার যৌবনের চাহিদার উপর আল্লাহ্র ইবাদতকে প্রাধান্য দেয় সে যদি তার যৌবনের কামনা-বাসনার বিপরীতে না দাঁড়াত তাহ'লে তার পক্ষে তা করা সম্ভব হ'ত না। যে ব্যক্তির মন মসজিদের সাথে যুক্ত থাকে, দুনিয়ার নানা স্বাদ-আহ্লাদ ও উপভোগের জায়গায় যাওয়া বাদ না দিলে তার পক্ষে কোনক্রমেই মসজিদে যাওয়া সম্ভব হ'ত না। বাম হাতকে না জানিয়ে ডান হাতে দানকারী যদি তার মনস্কামনার উপর জোর খাটাতে না পারে তাহ'লে তার পক্ষেও এমন দান করা কখনই সম্ভব হয় না। যাকে কোন সুন্দরী বংশীয় মহিলা কুকর্মের প্রতি আহ্বান জানায় এবং আল্লাহ্র ভয়ে সে তা না করে, সে তো তার ইন্দ্রিয় সম্ভোগের সুযোগ প্রত্যাখ্যানের ফলেই এমনটা করতে সক্ষম হয়। আর যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁর ভয়ে তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে মূলত নিজ কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতাই তাকে ঐ স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। সুতরাং কিয়ামতের দিনে হাশরের ময়দানের গরম তাপ, ঘাম ও দুর্বিসহ অবস্থায় তাদের উপর প্রভাব খাটানোর কোনই সুযোগ থাকবে না। অথচ কুপ্রবৃত্তির পূজারীরা সেদিন উত্তাপ আর ঘামে জর্জরিত হবে। আর হাশরের ময়দানে এহেন অবস্থার পর তারা খেয়ালখুশির কারাগারে প্রবেশের অপেক্ষায় থাকবে'।[২২]

৩. উচ্চমর্যাদা লাভ :

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বলেছেন, المروءة ترك الـــشهوات وعصيان الهوى، فاتباع الهوى يزمن المروءة ومخالفته تنعشها 'পৌরুষ হ'ল কামনা-বাসনা বর্জন এবং কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতার নাম। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ পৌরুষকে ব্যাধিগ্রস্ত করে দেয়, আর তার বিরোধিতায় পৌরুষ সুস্থ-সবল থাকে'।[২৩] মুহাল্লাব বিন আবু ছাফরাকে বলা হ'ল, 'কীভাবে আপনি এত উচ্চমর্যাদা লাভ করলেন'? উত্তরে তিনি বলেন, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা অবলম্বন এবং প্রবৃত্তির বিরোধিতার মাধ্যমে'।[২৪]

জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, 'বিদ্বানদের মধ্যে সেই বেশী মহৎ, যে তার দ্বীন সাথে নিয়ে দুনিয়ার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচে এবং কামনা-বাসনার উপর তার কর্তৃত্ব মযবূত করে'।[২৫] আবু আলী আদ-দাক্কাক বলেছেন, من ملك شهوته في حال شبيبته أعزه الله تعالى في حال كهولتـــه 'যৌবনে যে তার কামনা-বাসনার উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পেরেছে, বার্ধক্যে আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মান দান করবেন'।[২৬]

কবি ইবনু আব্দিল কাভী বলেছেন,

فَمَنْ هَجَرَ اللَّذَّاتِ نَالَ الْمُنَى وَمَنْ + أَكَبَّ عَلَى اللَّذَّاتِ عَضَّ عَلَى الْيَدِ

وَفِيْ قَمْعِ أَهْوَاءِ النُّفُوْسِ اعْتِزَازُهَا + وَفِيْ نَيْلِهَا مَا تَشْتَهِيْ ذُلٌّ سَرْمَدِ

وَلَا تَشْتَغِلْ إِلَّا بِمَا يُكْسِبُ الْعُلَا + وَلَا تُرْضِ النَّفْسَ النَّفِيْسَةَ بِالرَّدِي

وَفِيْ خَلْوَةِ الْإِنْسَانِ بِالْعِلْمِ أُنْسُهُ + وَيَسْلَمُ دِيْنُ الْمَرْءِ عِنْدَ التَّوَحُّدِ

وَيَسْلَمُ مِنْ قِيْلٍ وَقَالَ وَمِنْ أَذَى + جَلِيْسٍ وَمِنْ وَاشٍ بَغِيْضٍ وَحُسَّدِ

فَكُنْ حِلْسَ بَيْتٍ فَهْوَ سِتْرٌ لِعَوْرَةٍ + وَحِرْزُ الْفَتَى عَنْ كُلِّ غَاوٍ وَمُفْسِدِ

وَخَيْرُ جَلِيْسِ الْمَرْءِ كُتْبٌ تُفِيْدُهُ + عُلُوْمًا وَآدَابًا وَعَقْلاً مُؤَيِّدِ

'যে স্বাদ-আহ্লাদ ত্যাগ করেছে সে আশা পূরণ করতে পেরেছে। আর যে স্বাদ-আহ্লাদের মাঝে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সে অনুশোচনায় হাত কামড়ে ধরেছে। মনের কামনা-বাসনাকে দমন করাতেই তার সম্মান নিহিত রয়েছে। কিন্তু মন যা চায় তাই জোগাতে থাকলে এক সময় চিরস্থায়ী লাঞ্ছনায় ডুবে যেতে হবে। কাজেই উচ্চমর্যাদা অর্জিত হয় এমন কাজ বাদে অন্য কোন কাজে মশগূল হয়ো না। মূল্যবান জীবনটাকে নিকৃষ্ট জিনিসের মাঝে সন্তুষ্ট থাকতে দিও না। একান্তে বিদ্যাচর্চা মানুষের জন্য বন্ধুত্ব বয়ে আনে আর একাকীত্বের মাঝেই মানুষের দ্বীন-ধর্ম-নিরাপদ থাকে। সে সমালোচনা, খারাপ সঙ্গীর কষ্টদান এবং বিদ্বেষপরায়ণ নিন্দুক ও হিংসুকের হিংসা থেকে রক্ষা পায়। সুতরাং তুমি সর্বদা তোমার ঘরে অবস্থান কর। এটাই তো তোমার গোপনীয়তার জন্য হবে পর্দা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টাচারী ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী থেকে (তরুণের) রক্ষাকবচ। উপকারী বই-পুস্তকই তো মানুষের উত্তম সঙ্গী। যা তাকে বিদ্যা-বুদ্ধি ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়'।[২৭]

৪. সংকল্পের দৃঢ়তা :

কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষের সঙ্কল্পকে দুর্বল করে দেয় এবং তার বিরোধিতা সংকল্পকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে। এই দৃঢ় সংকল্পই বান্দার জন্য আল্লাহ্র ও আখিরাতের পথের বাহন। সুতরাং যানবাহন যখন বিকল হয়ে যাবে তখন মুসাফিরের যাত্রাও পণ্ড হয়ে যাবে। ইয়াহইয়া বিন মু'আযকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, 'সবচেয়ে বিশুদ্ধ সংকল্পের অধিকারী কে? তিনি বললেন, 'তার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জয়লাভকারী'।[২৮]

৫. স্বাস্থ্য রক্ষা :

ইবনু রজব বলেছেন, জনৈক বিদ্বান ১০০ বছর বয়স পার করেছিলেন, তখনও তার দেহ সুঠাম এবং বোধশক্তি সতেজ ছিল। একদিন তিনি খুব জোরে এক লাফ দিলেন। সেজন্য তাকে গালমন্দ করা হ'ল। কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন,

২২. *রাওযাতুল মুহিব্বীন, পৃঃ ৪৮৫-৪৮৬।*
২৩. *রাওযাতুল মুহিব্বীন, পৃঃ ৪৭৭-৪৭৮।*
২৪. *ইবনু আবিদ্দুনিয়া, আল-আকলু ও ফাযলুহু, পৃঃ ৯২।*
২৫. *যাম্মুল হাওয়া, পৃঃ ২৭।*
২৬. *রাওযাতুল মুহিব্বীন, পৃঃ ৪৮৩।*
২৭. *আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ ৩/৩০৩-৩০৪।*
২৮. *যাম্মুল হাওয়া, পৃঃ ২৬।*

ছোটকালে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে আমরা পাপ-পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করেছি, তাই বুড়োকালে আল্লাহ আমাদের জন্য সেগুলো রক্ষা করছেন। এর বিপরীতে জনৈক পূর্বসূরী ব্যক্তি এক বৃদ্ধকে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে দেখে বললেন, এই লোকটা অবশ্যই দুর্বল। সে শৈশবে আল্লাহ্র হক নষ্ট করেছিল, তাই তার বার্ধক্যে আল্লাহ তাকে কষ্টে ফেলেছেন'।[২৯]

৬. দুনিয়ার বালা-মুছীবত থেকে মুক্তি :

ইবরাহীম বিন আদহাম (রহঃ) বলেছেন, أَشَدُّ الْجِهَادِ جِهَادُ الْهَوَى، وَمَنْ مَنَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا فَقَدِ اسْتَرَاحَ مِنَ الدُّنْيَا وَبَلَائِهَا، وَكَانَ مَحْفُوْظًا وَمُعَافًى مِنْ أَذَاهَا 'কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদই সবচেয়ে কঠিন জিহাদ। যে নিজের মনকে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে হেফাযত করতে পারবে, সে দুনিয়া ও দুনিয়ার বালা-মুছীবত থেকে আরামে থাকবে। সে দুনিয়ার কষ্ট-ক্লেশ থেকেও রক্ষা পাবে'।[৩০]

খেয়ালখুশির অনুসরণের প্রতিকার

যে কুপ্রবৃত্তির শিকারে পরিণত হয়েছে, কুপ্রবৃত্তির থাবা থেকে বাঁচার জন্য তার মনের চিকিৎসা প্রয়োজন। তাতে করে আল্লাহ তা'আলা হয়তো তাকে দয়া করবেন এবং সৎলোকদের কাতারে তাকে শামিল করবেন। কুপ্রবৃত্তির চিকিৎসায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।-

এক. পূতপবিত্র মহামহিম আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে যাওয়া এবং কুপ্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাঁর নিকট দো'আ করা। নবী করীম (ছাঃ) ও পূর্বসূরীদের এটা ছিল নিয়মিত অভ্যাস।

কুতবা বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এই বলে দো'আ করতেন, اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি মন্দ স্বভাব, আমল ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে'।[৩১]

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) খালিদ বিন ছাফওয়ান (রাঃ)-কে বললেন, সংক্ষেপে আমাকে কিছু নছীহত করুন। তিনি তখন বললেন, يَا أَمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ أَقْوَامًا غَرَّهُمْ سِتْرُ اللهِ، وَفَتَنَهُمْ حَسَنُ الثَّنَاءِ فَلَا يَغْلِبَنَّ جَهْلُ غَيْرِكَ بِكَ عِلْمَكَ بِنَفْسِكَ، أَعَاذَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ أَنْ نَكُوْنَ بِالسِّتْرِ مَغْرُوْرِيْنَ وَبِثَنَاءِ النَّاسِ مَسْرُوْرِيْنَ وَعَمَّا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْنَا مُتَخَلِّفِيْنَ وَمُقَصِّرِيْنَ وَإِلَى الْأَهْوَاءِ مَائِلِيْنَ 'আমীরুল মুমিনীন! অনেক লোক আছে যারা আল্লাহপাক পাপ গোপন রাখবেন এই আশায় ধোঁকায় পতিত হয়, আবার অন্যদের মুখে নিজেদের প্রশংসা শুনেও তারা ফিৎনার শিকার হয়। কাজেই আপনার সম্বন্ধে অন্যের অজ্ঞতাপ্রসূত কথা যেন আপনার সম্বন্ধে আপনার নিজের জ্ঞানের উপর বিজয়ী না হয় (অর্থাৎ যে গুণ ও যোগ্যতা আপনার মধ্যে নেই বলে আপনার জানা অন্যেরা আপনার মধ্যে সেই গুণ ও যোগ্যতা আছে বলে আপনার মিথ্যা প্রশংসা করলে আপনি তাতে খুশি ও প্রলুব্ধ হবেন না)। মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে ও আপনাকে রক্ষা করেন- যাতে আমরা আল্লাহ্র পাপ গোপন রাখার কথা দ্বারা প্রতারিত না হই, অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে উৎফুল্ল না হই, আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর যা কিছু ফরয করেছেন তা পালনে পিছপা না হই বা কোন ত্রুটি না করি এবং খেয়ালি মন-মানসিকতার দিকে যেন ঝুঁকে না পড়ি'। একথা শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, أَعَاذَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ مِنِ اتِّبَاعِ الْهَوَى 'আল্লাহ আমাদেরকে এবং তোমাকে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে রক্ষা করুন'।[৩২]

ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) দো'আ করতেন আর বলতেন, اَللَّهُمَّ اعْصِمْنِي بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنَ اخْتِلَافٍ فِي الْحَقِّ، وَمِنَ اتِّبَاعِ الْهَوَى بِغَيْرِ هُدًى مِنْكَ، وَمِنْ سُبُلِ الضَّلَالَةِ، وَمِنْ شُبُهَاتِ الْأُمُوْرِ، وَمِنَ الزَّيْغِ، وَاللَّبْسِ، وَالْخُصُوْمَاتِ 'হে আল্লাহ! আপনার কিতাব আল-কুরআন এবং আপনার নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের বরকতে আমাকে ন্যায় ও যথার্থ বিষয়ে মতভেদ, আপনার হেদায়াত ছেড়ে খেয়াল-খুশির অনুসরণ, গোমরাহী, সন্দেহজনক বিষয়াদি, অন্তরের বক্রতা, সন্দেহ ও বাক-বিতণ্ডা থেকে রক্ষা করুন'।[৩৩]

দুই. খেয়ালখুশির বিরোধী জিনিস দ্বারা অন্তর পূর্ণ রাখা :

আল্লাহ্র ভালবাসা অন্তরে ভরে রাখলে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের আমল করে গেলে এক সময় অন্তর সম্পূর্ণরূপে খেয়ালখুশির অনুসরণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

তিন. আলেম ও আল্লাহভীরুদের সাহচর্য গ্রহণ :

কবি ইবনু আব্দুল কাভী বলেছেন,

وَخَالِطْ إِذَا خَالَطْتَّ كُلَّ مُوَفَّقٍ + مِنَ الْعُلَمَاءِ أَهْلِ التُّقَى وَالتَّسَدُّدِ

يُفِيْدُكُ مِنْ عِلْمٍ وَيَنْهَاكَ عَنْ هَوًى + فَصَاحِبْهُ تُهْدَ مِنْ هُدَاهُ وَتَرْشُدْ

وَإِيَّاكَ وَالْهَمَّازَ إِنْ قُمْتَ عَنْهُ وَالْ + بَذِيِّ فَإِنَّ الْمَرْءَ بِالْمَرْءِ يَقْتَدِيْ

وَلَا تَصْحَبِ الْحَمْقَى فَذُو الْجَهْلِ إِنْ يَرُمْ+صَلَاحًا لِشَيْءٍ يَا أَخَا الْحَزْمِ يُفْسِدْ

২৯. *ইবনু রজব, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃঃ ১৮৬।*
৩০. *হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/১৮; শু'আবুল ঈমান, পৃঃ ৮৭৬।*
৩১. *তিরমিযী হা/৩৫৯১, মিশকাত হা/২৪৭১, সনদ ছহীহ।*
৩২. *হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/১৮।*
৩৩. *ঐ, ৪/২১২।*

'যখন তুমি উঠাবসা করবেই তখন আল্লাহভীরু আলেম ও সঠিক পথের অনুসারী সৎ মানুষের সঙ্গে উঠাবসা করো।

তাতে তুমি যেমন বিদ্যা দ্বারা উপকৃত হবে, তেমনি খেয়ালখুশির অনুসরণ থেকে নিবৃত্তি লাভ করবে। তুমি এমন মানুষের সঙ্গী হও। দেখবে তার সৎপথের দিশা থেকে তুমি দিশা লাভ করছ।

সাবধান! সাবধান!! অগোচরে নিন্দাকারী অশ্লীল ভাষীর ধারে কাছেও যাবে না। কেননা মানুষ মানুষের অনুসরণ করে।

আর নির্বোধদের সাথে থাকতে যেয়ো না। কেননা হে সাবধানী বন্ধু! নির্বোধ যদি কোন ভাল কিছুও করতে চায় তবুও সে তা বিনষ্ট করে ফেলে'।[৩৪]

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) অনেকগুলো বিষয় উল্লেখ করেছেন যা অবলম্বন করলে আল্লাহ্র মর্যিতে যে কোন ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তির ছোবল থেকে মুক্তি পাবে। তিনি বলেছেন, 'যদি প্রশ্ন তোলা হয়- যে কুপ্রবৃত্তির মাঝে ডুবে আছে সে কীভাবে তা থেকে মুক্তি পেতে পারে? উত্তরে বলা যায়, আল্লাহ্র সাহায্য ও সহায়তায় নিম্নের কাজগুলো তাকে মুক্তি দিতে পারে।-

প্রথম : কুপ্রবৃত্তি বা খেয়ালখুশির অনুসরণ না করতে মন থেকে পাকাপোক্ত সঙ্কল্প করা।

দ্বিতীয় : ধৈর্য-সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা। যখন মনের মধ্যে খেয়ালখুশি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, তখনই ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হবে। ধৈর্য হারানো চলবে না।

তৃতীয় : যাতে এক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বন করা যায় সেজন্য মানসিক শক্তি বাড়াতে হবে। বলবীর্যতা তো আসলে সময়মত ধৈর্যের সাথে টিকে থাকার নাম। আর বান্দা ধৈর্যের মাধ্যমে যে জীবন-জীবিকা লাভ করে তাই উত্তম।

চতুর্থ : কামনা-বাসনার অনুসরণ না করলে ভবিষ্যতে যে শুভ পরিণতি অপেক্ষা করছে তা ভেবে দেখা এবং ধৈর্যের দাওয়া দ্বারা আরোগ্য লাভ করা।

পঞ্চম : খেয়ালখুশির আনুগত্য করলে তাৎক্ষণিক স্বাদ হয়তো মিলবে। কিন্তু সেজন্য কী পরিমাণ খেসারত ও যন্ত্রণা পোহাতে হবে তা লক্ষ্য করা।

ষষ্ঠ : আল্লাহ তা'আলার নিকট তার অবস্থান আর মানুষের মনে তার যে জায়গা আছে তা বহাল রাখতে সচেষ্ট হওয়া। খেয়ালখুশিমত চলা থেকে এটা তার জন্য অনেক উত্তম ও উপকারী।

সপ্তম : পাপের স্বাদ থেকে চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ও পাপ থেকে দূরে থাকার স্বাদকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

অষ্টম : সে যে তার খেয়ালখুশি নামক শত্রুকে পরাস্ত ও তাকে পদানত করতে পেরেছে সেজন্য আনন্দিত হওয়া। এজন্যও আনন্দিত হওয়া যে তার শত্রু নিজের ব্যর্থতার জন্য ক্রোধ ও দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত হয়ে ফিরে গেছে। তার থেকে সে তার আশা পূরণ করতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলাও চান বান্দা যেন তার শত্রুকে ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত করার মত আমল করে। আল্লাহ কুরআনুল কারীমে বলেছেন, وَلَا يَطَئُوْنَ مَوْطِئًا يَغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ 'এমন কোন স্থানে তারা যাবে, যেখানে যাওয়ায় কাফিরদের তাদের উপর ক্রোধ সৃষ্টি হবে এবং শত্রুদের কাছ থেকেও যুদ্ধলব্ধ গণীমত হিসাবে তারা কিছু লাভ করবে। মূলতঃ এর প্রতিটি কাজের বদলে তাদের জন্য নেক আমল লেখা হবে' *(তওবা ৯/১২০)*। প্রিয়জনের শত্রুকুলকে ক্ষেপিয়ে তোলা ও ক্ষুব্ধ করে তোলা সত্যিকারের মহব্বতের লক্ষণ।

নবম : খেয়ালখুশির বিরোধিতা করলে দুনিয়াতেও সম্মান মিলবে, আখিরাতেও সম্মান মিলবে, প্রকাশ্যেও ইযযত লাভ হবে, গোপনেও ইযযত লাভ হবে। পক্ষান্তরে খেয়ালখুশির অনুসরণ করলে সর্বত্রই ধ্বংস ডেকে আনবে, প্রকাশ্যেও সে অপদস্থ হবে অপ্রকাশ্যেও অপদস্থ হবে। এসব কথা মনে করে এবং জেনে বুঝে সকলকে খেয়ালখুশির অনুসরণ না করে বরং বিরোধিতায় সচেষ্ট হ'তে হবে।[৩৫]

প্রশংসনীয় প্রবৃত্তি ও নিন্দনীয় প্রবৃত্তি

খেয়ালখুশি মাত্রেই যেমন নিন্দনীয় নয় তেমনি তার সবটাই প্রশংসনীয়ও নয়। এক্ষেত্রে বাড়াবাড়িটাই নিন্দনীয়। সুতরাং উপকার বয়ে আনা ও অপকার প্রতিরোধ করার উপর বেশী যা কিছু করা হবে তাই হবে নিন্দনীয়। এক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কামনা-বাসনাও আছে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রিয়। আর তা তখনই হবে যখন মন তাই কামনা করবে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রিয়।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে সমস্ত মহিলা নিজেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিয়ের জন্য তাঁর সামনে প্রস্তাব পেশ করত আমার মনের মধ্যে তাদের জন্য একরকম অস্বস্তি কাজ করত। আমি বলতাম, একজন মেয়ে মানুষ কি এভাবে নিজেকে দান করতে পারে? তারপর যখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ 'তুমি ইচ্ছে করলে তাদের মধ্য থেকে কাউকে নিজের কাছ থেকে দূরে রাখতে পার, আবার যাকে ইচ্ছা নিজের কাছে স্থান দিতে পার। যাকে তুমি দূরে রেখেছিলে তাকে যদি পুনরায় তুমি নিজের কাছে রাখতে চাও তাতেও তোমার কোন দোষ হবে না' *(আহযাব ৩৩/৫১)*। তখন আমি মনে মনে স্বগতোক্তি করলাম, আমার মনে হয় আমার প্রভু দ্রুতই আমার কামনার অনুকূলে সাড়া দিয়েছেন'।[৩৬]

---

৩৪. ইবনু মুফলিহ, আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ ৩/৩০৪।

৩৫. রাওযাতুল মুহিব্বীন পৃঃ ৪৭১-৪৭২।

৩৬. বুখারী হা/৪৭৮৮।

নবী করীম (ছাঃ)ও কিছু কিছু জিনিসের আকাঙ্খা করতেন। আল্লাহ তা'আলা তার আকাঙ্খার অনুকূলে কুরআনের আয়াত নাযিল করতেন। এতে করে বুঝা যায়, মন যা কামনা করে তার কতক প্রশংসনীয়। নবী করীম (ছাঃ)-এর কামনার মধ্যে ছিল, বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তন করা। এর কারণ সম্পর্কে আলেমগণ বলেছেন নবী করীম (ছাঃ) ইবরাহীম (আঃ)-এর কিবলার অনুসরণ করতে মনে মনে কামনা করতেন।[৩৭]

আবু বারযা নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِيْ بُطُوْنِكُمْ وَفُرُوْجِكُمْ وَمُضِلاَّتِ الْفِتَنِ 'আমি কেবলই তোমাদের ক্ষেত্রে তোমাদের পেট তথা পানাহার ও জননেন্দ্রিয়ের অবৈধ সম্ভোগ এবং শরী'আত বিরুদ্ধ কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার ভয় করি'।[৩৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিন্তু তাঁর উম্মাতের জন্য সব রকম কামনার ভয় করেননি। বরং তিনি কেবল ভয় করেছেন পথভ্রষ্টকারী কামনা-বাসনা। কারণ কামনা-বাসনা কখনো কখনো পথভ্রষ্টকারী হয়ে থাকে। এরূপ কামনা-বাসনা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এবং দ্বীন-ধর্মকে বিনষ্ট করে দেয়। কিন্তু যে কামনা-বাসনা পথভ্রষ্ট করে না তাতে কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাই সে সম্পর্কে সতর্ক করেননি। কিন্তু নিন্দনীয় কামনা-বাসনাই অধিকহারে প্রচলিত। এজন্যই আমরা অনেক আয়াত, হাদীছ এবং পূর্বসূরী ছাহাবী, তাবেঈগণের ও তাঁদের পরবর্তীদের কথায় সাধারণভাবে কামনা-বাসনার নিন্দা দেখতে পাই। এখানে অবশ্যই ওগুলো দ্বারা নিন্দনীয় কামনা বুঝানো হয়েছে, সাধারণভাবে সব কামনা ও খেয়ালখুশি নয়।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, 'কামনা-বাসনা ও লালসার অনুগামী লোকেরা বেশির ভাগই উপকার লাভের মাত্রা পর্যন্ত এসে থামে না; বরং সীমালংঘন করে। তাই সাধারণভাবে এর ক্ষতিকারিতার কারণেই কামনা ও লালসার নিন্দা করা হয়েছে। খুব কম লোকই এক্ষেত্রে ইনছাফ বজায় রাখতে পারে বা ইনছাফের পর্যায়ে এসে থামতে পারে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর গ্রন্থে যেখানেই কামনা বা খেয়ালখুশির কথা বলেছেন, সেখানেই তার নিন্দা করেছেন। হাদীছেও তা নিন্দনীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, ক্ষেত্র বিশেষে শর্তযুক্তভাবে তার প্রশংসা এসেছে'।[৩৯]

হাদীছে যে কামনার নিন্দা করা হয়নি তা যেমন ইতিপূর্বে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, তেমনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছেও এসেছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না যে পর্যন্ত না তার কামনা-বাসনা আমি যে দ্বীন নিয়ে এসেছি তার অনুগত হয়'।[৪০]

হাদীছ হ'তে বুঝা যায়, কিছু কামনা প্রশংসনীয়। আর তা হ'ল সেসব কামনা যেগুলো শরী'আতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে দিন বদর যুদ্ধ হ'ল, সেদিন বন্দীদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-কে বলেছিলেন, مَا تَرَوْنَ فِى هَؤُلاَءِ الأُسَارَى 'এসব বন্দীদের বিষয়ে আপনাদের অভিমত কী'? তখন আবুবকর (রাঃ) বলেছিলেন, يَا نَبِىَّ اللهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيْرَةِ أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُوْنُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلإِسْلاَمِ 'হে আল্লাহ্‌র নবী! তারা তো আমাদেরই চাচাত ভাই ও জ্ঞাতি লোক। আমি মনে করি, মুক্তিপণ নিয়ে আপনি ওদের ছেড়ে দিন। মুক্তিপণের অর্থ কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি জোগাবে। আর এ লোকগুলোকেও আল্লাহ ভবিষ্যতে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় দিতে পারেন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুনরায় বললেন, مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ 'হে খাত্ত্বাবের সন্তান ওমর! তোমার অভিমত কী'? আমি বললাম,

لاَ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَرَى الَّذِىْ رَأَى أَبُوْ بَكْرٍ وَلَكِنِّى أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيْلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنِّى مِنْ فُلاَنٍ- نَسِيْبًا لِعُمَرَ- فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَإِنَّ هَؤُلاَءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا فَهَوِىَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ-

'না, আল্লাহ্‌র কসম! আবুবকর যেমন ভাবছেন আমি তা মনে করি না। বরং আমার সিদ্ধান্ত এই যে, আপনি ওদেরকে আমাদের হাতে দিন, আমরা ওদের গর্দান উড়িয়ে দেই। আকীলকে দিন আলীর হাতে সে তার গর্দান উড়িয়ে দিক। আমার হাতে দিন অমুককে (ওমরের বংশীয়) আমি তার ঘাড় নামিয়ে দেই। এসব লোক তো কাফিরদের বড় বড় নেতা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকরের ইচ্ছেমত কাজ করলেন। আমি যা বললাম সে মত অনুযায়ী করলেন না'।[৪১]

দেখুন দয়াল নবী (ছাঃ) আবুবকর (রাঃ)-এর কথা ও ইচ্ছার দিকে ঝুঁকলেন। কারণ এতে তিনি ইসলামের কল্যাণ দেখেছিলেন। এটা ছিল প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত। নবী করীম (ছাঃ) নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীতে ওমর (রাঃ)-এর সিদ্ধান্তকে সঠিক আখ্যা দিয়ে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল।

---

৩৭. তাফসীর ত্বাবারী ২/২২ পৃঃ।
৩৮. আহমাদ হা/১৯৭৮৮, ছহীহ তারগীব হা/৫২, সনদ ছহীহ।
৩৯. রওযাতুল মুহিব্বীন (৪৬৯) ঈষৎ পরিবর্তন সহ।
৪০. নববী, শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/১৬৭, আলবানী, সনদ যঈফ।
৪১. মুসলিম হা/১৭৬৩, ইবনু হিব্বান হা/৪৭৯৩।

শেষ কথা :

খেয়ালখুশি বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা একটি আয়াসসাধ্য কষ্টকর ব্যাপার। এ সংগ্রামে দেহ-মন উভয়কে কষ্টের বোঝা বইতে হয়। তবে এ সংগ্রামের পরিণাম হয় খুবই সুন্দর এবং ফলাফল হয় খুবই মর্যাদার। তাই খেয়ালখুশির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া থেকে দুর্বলচেতা অসুস্থ মন-মানসিকতার লোকেরা ছাড়া আর কেউ-ই পিছপা হয় না। কবি আবুল আতাহিয়া বলেন,

أَشَدُّ الْجِهَادِ جِهَادُ الْهَوَى + وَمَا كَرَّمَ الْمَرْءَ إِلاَّ التُّقَى

‘কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদই (সংগ্রাম) সবচেয়ে কঠিন জিহাদ। আর তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতিই কেবল মানুষকে মহিমান্বিত করে’।

আরেক কবি বলেছেন,

صَبَرْتُ عَلَى الْأَيَّامِ حَتَّى تَوَلَّتِ + وَأَلْزَمْتُ نَفْسِي صَبْرَهَا فَاسْتَمَرَّتِ

وَمَا النَّفْسُ إِلاَّ حَيْثُ يَجْعَلُهَا الْفَتَى + فَإِنْ أُطْمِعَتْ تَاقَتْ وَإِلاَّ تَسَلَّتِ

‘আমি কালের কুটিলচক্রের শিকার হয়ে বিপদে ধৈর্য ধরেছি। ফলে এক সময় বিপদ কেটে গেছে। আমি আমার মনকে ধৈর্যের উপর অবিচল রেখেছি, ফলে সে ধৈর্য ধারণ করেই গেছে’।

আসলে মন তো সেখানেই থাকে যেখানে মানুষ তাকে রাখে। যদি মনের সামনে লোভ ধরিয়ে দেওয়া হয় তাহ’লে সে লোভের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। নতুবা সে শান্ত থাকে’।[৪২]

খেয়ালখুশির অনুসরণ না করার সবচেয়ে বড় আলামত হ’ল পার্থিব জীবনের সাজসজ্জা ও চাকচিক্য থেকে দূরে থাকা। মালিক বিন দীনার (রহঃ) বলেন, مَنْ تَبَاعَدَ مِنْ زُهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَذَلِكَ الْغَالِبُ لِهَوَاهُ ‘যে দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য ও আড়ম্বর থেকে দূরে থাকবে সেই তার কামনা-বাসনাকে পরাস্তকারী হবে’।[৪৩]

খেয়ালখুশি সব মানুষের মধ্যেই অনুপ্রবেশ করে। শুধুই নাদান-মূর্খ কিংবা শিশুদের মধ্যেই নয়; বরং আলেম-ওলামা, বিদ্বান, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকলের মধ্যেই তা প্রবেশ করে। জনৈক বিজ্ঞজন বলেছেন, অভিজ্ঞ জ্ঞানী-গুণীজনেরও পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে তার সিদ্ধান্ত যাতে খেয়ালখুশির প্রেক্ষিতে না হয় সেজন্য’।[৪৪]

সুতরাং কারো জন্য এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, আমি তো আমার খেয়ালখুশির অনুসরণ করি না, সুতরাং খেয়ালখুশির নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে যেসব কথা এসেছে তা আমার বেলায় প্রযোজ্য নয়। মানছূর আল-ফকীহ বলেছেন,

إِنَّ الْمَرَائِيَ لاَ تُرِيْكَ + خُدُوْشَ وَجْهِكَ فِيْ صَدَاهَا

وَكَذَاكَ نَفْسُكَ لاَ تُرِيْكَ + عُيُوْبَ نَفْسِكَ فِيْ هَوَاهَا

‘আয়না জংধরা বা ময়লাযুক্ত হ’লে তাতে তোমার মুখের দোষ ধরা পড়বে না। অনুরূপভাবে খেয়ালখুশির মাঝে মজে থাকলে তুমি তোমার নিজের ভিতরকার দোষ-ত্রুটি দেখতে পাবে না’।[৪৫]

বরং যিনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান, ধার্মিক ও সবচেয়ে বড় বিদ্বান বলে পরিচিত তাঁর মধ্যেও কখনো কখনো খেয়ালখুশি অনুপ্রবেশ করে। তাই মহামহিম আল্লাহ তা‘আলার নিকট আমাদের প্রার্থনা তিনি যেন খেয়ালখুশির উপায়-উপকরণ থেকে আমাদের হেফাযত করেন। নিকৃষ্ট আচার-আচরণ থেকে আমাদের ফিরিয়ে রাখেন এবং আমাদেরকে ভাল কাজের তাওফীক দেন। আর আল্লাহ তা‘আলা করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ, সঙ্গী-সাথীদের সকলের উপর।

---

৪২. *যাম্মুল হাওয়া, পৃঃ ১৫৩।*
৪৩. *হিলয়াতুল আওলিয়া ২/৩৬৪।*
৪৪. *বাহজাতুল মাজালিস ওয়া উনসুল মাজালিস, পৃঃ ১৭১।*
৪৫. *আবু উবায়েদ আল-বিকরী, ফাছলুল মাকাল ফি শারহি কিতাবুল আমছাল, পৃঃ ২৭৫।*

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত বই

হিংসা ও অহংকার
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
প্রাপ্তিস্থান :
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১ ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০ ৮০০৯০০

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।
আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।
সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি
AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু
এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।
২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ঈমান

*হাফেয আব্দুল মতীন**

(শেষ কিস্তি)

বিভিন্ন সৎ আমলের মাধ্যমে যেমন মানুষের ঈমান বৃদ্ধি পায়, তেমনি নানাবিধ কারণে ঈমান কমে যায়। যেসব কারণে ঈমান কমে যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হ'ল-

(১) অজ্ঞতা : এটি ঈমান হ্রাসের অন্যতম কারণ। ইলম যেমন ঈমান বৃদ্ধি করে, অজ্ঞতা তেমনি ঈমান হ্রাস করে। মানুষ যত বেশী কল্যাণকর বিদ্যা অর্জন করবে তার ঈমান তত বেশী বাড়বে।

অজ্ঞতার কারণে আজকে বিশ্বে মানুষের এত অধঃপতন। কেননা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল আল্লাহ সম্পর্কে জানা। এজন্য তাওহীদ বুঝতে হবে। কারণ তাওহীদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে আজকে অধিকাংশ মানুষ বিভিন্ন ধরনের শিরকে লিপ্ত হচ্ছে। কবর পূজাকে বড় ইবাদত মনে করছে। কবরে রুকূ-সিজদা, যবেহ, কুরবানী, মানত, দো'আ, সাহায্য প্রার্থনা, বরকত চাওয়া প্রভৃতি শিরকী আমল করছে, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। তাছাড়া বিদ'আতী কর্মের তো শেষ নেই। ওরস, মীলাদুন্নবী, শবে মে'রাজ, শবে বরাত পালন, ফরয ছালাতের পরে জামা'আতবদ্ধ ভাবে দো'আ করা, মৃত ব্যক্তির নামে চল্লিশা, কুরআন খতম, এগুলো সবই মানুষ করছে অজ্ঞতার কারণে। আর এভাবে মানুষের ঈমান কমছে। উল্লেখ্য যে, হাতে, গলায়, কোমরে তাবীয ঝুলানো, বাত ভাল হবার উদ্দেশ্যে হাতে লোহার বালা পরা, লাল সুতা পরা, অন্যের নামে কসম খাওয়া, মানুষ দেখানো আমল করা ইত্যাদি সকল কাজ অজ্ঞতার কারণেই করছে। যা মানুষের ঈমান নষ্ট করে দেয়। এর ফলে পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই অজ্ঞতা দূর করতে হবে এবং মানুষের মধ্যে ইলমের প্রসার ঘটাতে হবে। কেননা অজ্ঞতাই হচ্ছে পাপে পতিত হওয়ার সর্ববৃহৎ কারণ। মহান আল্লাহ বলেন, وَجَاوَزْنَا بِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُوْنَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوْا يَا مُوْسَى اجْعَل لَّنَا إِلَـهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ 'আমরা সাগর পার করে দিয়েছি বনী ইসরাঈলকে। তখন তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছল, যারা নিজ হাতে নির্মিত মূর্তিপূজায় নিয়োজিত ছিল। তারা বলতে লাগল, হে মূসা! আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন, তোমরা বড়ই অজ্ঞ সম্প্রদায়' *(আ'রাফ ৭/১৩৮)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلُوْطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُوْنَ- أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ- 'স্মরণ কর লূতের কথা, তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন, তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করছ, অথচ এর পরিণতির কথা তোমরা অবগত আছ? তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়' *(নামল ২৭/৫৪-৫৫)*। মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন, قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُوْنِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ 'বল, হে মূর্খরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে আদেশ করছ?' *(যুমার ৩৯/৬৪)*।

এভাবে যে আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং পাপ কাজ করবে সে মূর্খ। তার এ অজ্ঞতা ও মূর্খতাবশতঃ কর্মকাণ্ডের জন্য অনুতপ্ত হয়ে মহান আল্লাহ্র দরবারে বিনীতভাবে তওবা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُوْلَـئِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيْماً حَكِيْماً 'অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে। এরাই হ'ল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ' *(নিসা ৪/১৭)*। তিনি আরো বলেন, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 'আর যখন তারা তোমাদের কাছে আসবে যারা আমাদের নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস করে, তখন তুমি বলে দিও, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের পালনকর্তা রহমত করা নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে, এরপরে তওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়' *(আন'আম ৬/৫৪)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوْا السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوْا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 'অনন্তর যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আপনার পালনকর্তা এসবের পরে তাদের জন্যে অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(নাহল ১৬/১১৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যত প্রকার পাপ করা হয় তা (শরী'আতের সঠিক জ্ঞান থেকে) অজ্ঞ থাকার কারণেই সংঘটিত হয়। সেটি ইচ্ছাকৃত হোক অথবা অনিচ্ছাকৃত হোক।[৪৬]

* *লিসান্স ও এম.এ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

৪৬. *তাফসীর ইবনে কাছীর ২/২৬২।*

মুজাহিদ বলেন, مَنْ عَصَى اللهَ فَهُوَ جَاهِلٌ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْ مَعْصِيَته আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি মূর্খ। যতক্ষণ না সে তার পাপাচার থেকে দূরে থাকে।[৪৭]

(২) আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিমুখ হওয়া ও ভুলে যাওয়া :

মানুষ যখন আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী থেকে বিমুখ হয় এবং তাঁকে ভুলে যায়, তখন মানুষের ঈমান কমে যায়। আল্লাহ্র ইবাদত থেকে গাফলতি করা মুনাফিক ও কাফেরদের চরিত্র। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّ يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُوْنَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ ‘আর আমরা সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না। তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না। আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হ’ল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ’ *(আ‘রাফ ৭/১৭৯)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُوْنَ، أُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ– ‘অবশ্যই যেসব লোক আমাদের সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে গাফিল। এমন লোকদের ঠিকানা হ’ল আগুন সেসবের বদলা হিসাবে যা তারা অর্জন করছিল’ *(ইউনুস ১০/৭-৮)*। তিনি অন্যত্র বলেন, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيْراً مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُوْنَ ‘অতএব আজকের দিনে সংরক্ষণ করছি আমরা তোমার দেহকে যাতে তোমার পশ্চাদবর্তীদের জন্য নিদর্শন হ’তে পারে। আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমাদের মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না’ *(ইউনুস ১০/৯২)*।

মানুষ আজ দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং তার আসল ঠিকানা পরকালকে ভুলে গেছে। মহান আল্লাহ বলেন, يَعْلَمُوْنَ ظَاهِراً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ ‘তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না’ *(রূম ৩০/৭)*। মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেন, وَاذْكُر رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيْفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِيْنَ ‘আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং অনুচ্চ স্বরে, সকালে ও সন্ধ্যায়। আর গাফেল হয়ো না’ *(আ‘রাফ ৭/২০৫)*। মহান আল্লাহ যিকিরের মাধ্যমেই মানুষ বেঁচে থাকে, এর বিপরীত করলে অন্তর মরে যায়। মুমিনের উচিৎ ভাল কাজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া। পরকালের জন্য, আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার জন্য আমল করা। আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিমুখ না হওয়া। যারা আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, তারা নিজের উপর যুলুম করে। এর পরিণতি খুব ভয়াবহ। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ‘যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে যালেম আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব’ *(সাজদাহ ৩২/২২)*।

যারা আল্লাহ্র স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা হিদায়াতের পথ থেকে অনেক দূরে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِيْ آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوْا إِذاً أَبَداً ‘তার চাইতে অধিক যালেম কে, যাকে তার পালনকর্তার কালাম দ্বারা বোঝানো হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার পূর্ববর্তী কৃতকর্ম সমূহ ভুলে যায়? আমরা তাদের অন্তরের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, যেন তারা না বোঝে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতার বোঝা। যদি আপনি তাদেরকে সৎপথের প্রতি দাওয়াত দেন, তবে কখনই তারা সৎপথে আসবে না’ *(কাহফ ১৮/৫৭)*। যারা আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিমুখ তারা উভয় জীবনে দুর্বিষহ জীবন যাপন করবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ‘আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমরা তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব’ *(ত্ব-হা ২০/১২৪)*। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিমুখ তার সাথী হবে শয়তান। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ‘যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমরা তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী’ *(যুখরুফ ৪৩/৩৬)*। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র স্মরণে বিমুখ তার কঠিন শাস্তি হবে। মহান আল্লাহ বলেন, كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْراً، مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْراً– ‘এমনিভাবে আমরা পূর্বে যা ঘটেছে, তার সংবাদ তোমার কাছে বর্ণনা করি। আমরা আমাদের কাছ থেকে আপনাকে দান করেছি পড়ার গ্রন্থ। যে

৪৭. *তাফসীর ত্বাবারী ৮/৯০।*

এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে কিয়ামতের দিন বোঝা বহন করবে' *(ত্ব-হা ২০/৯৯-১০০)*। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ হ'তে বিমুখ হয় তিনি তাকে কঠিন আযাবে প্রবেশ করাবেন *(জিন ৭২/১৭)*। সুতরাং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করতে হবে, তাঁর যিকির-আযকার ও ইবাদতের মাধ্যমে জীবন যাপন করতে হবে। কোন ক্রমেই তাকে ভুলে যাওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে স্মরণ করা ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করেছেন। তারাই তো পাপাচারী' *(হাশর ৫৯/১৯)*।

(৩) পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া : পাপ ও অন্যায়-অশ্লীল কাজের মাধ্যমে মানুষের ঈমান কমে। এমনকি সে ঈমান শূন্য হয়ে যায়। তাই সকল পাপ থেকে দূরে থাকতে হবে। আর কেউ পাপ করে বসলে তার থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হ'ল সাথে তওবা-ইস্তেগফার করা। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ 'হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(যুমার ৪৩/৫৩)*। তিনি আরো বলেন, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ 'তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন' *(শূরা ৪২/২৫)*। তাই মানুষকে সকল শিরক-বিদ'আত ও পাপাচার থেকে দূরে থাকতে হবে। তাহ'লে ইহলোকে কল্যাণ ও পরলোকে মুক্তি মিলবে। মানুষ যত সৎ আমল করবে ততই তার ঈমান বাড়বে। আর যত বেশী পাপ কাজ করবে তার ঈমান কমতে কমতে শূন্য হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ، وَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كَافِرُوْنَ 'আর যখন কোন সূরা নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্যেকার কিছু (মুশরিক) লোক বলে, এই সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল? বস্তুতঃ যারা ঈমান এনেছে, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দ লাভ করেছে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে রোগ আছে, এটি তাদের নাপাকির সাথে আরও নাপাকি বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে' *(তওবা ৯/১২৪-১২৫)*।

কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পাপের মধ্যে ও ছোট-বড় রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيْمًا 'যদি তোমরা কবীরা গোনাহ সমূহ থেকে বিরত থাক, তাহ'লে আমরা তোমাদের (ছোট খাট) ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক গন্তব্যে প্রবেশ করাব' *(নিসা ৪/৩১)*। তিনি আরো বলেন, اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ 'যারা বড় বড় গোনাহ ও অশ্লীলকার্য থেকে বেঁচে থাকে ছোটখাট অপরাধ করলেও নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত' *(নাজম ৫৩/৩২)*।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত এবং এক জুম'আ থেকে অপর জুম'আ, এক রামাযান থেকে অপর রামাযান এর মাঝে যত গোনাহ করা হয়, সবগুলির কাফফারাহ হয়। যদি কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে'।[৪৮]

আবু বকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. قُلْنَا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ، أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ. فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتَّى قُلْتُ لاَ يَسْكُتُ. 'আমি কি তোমাদের সব থেকে বড় গুনাহ সম্পর্কে খবর দিব না? আমরা বললাম, অবশ্যই তা, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। এ কথা বলার সময় তিনি হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এরপর (সোজা হয়ে) বসলেন এবং বললেন, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া (দু'বার)। তিনি ক্রমাগত একথা বলেই চললেন। এমনকি আমি বললাম, তিনি মনে হয় চুপ করবেন না।[৪৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهْوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ. 'কোন গুনাহ আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটাতো সত্যিই বড় গুনাহ। আমি বললাম, তারপর কোন গুনাহ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সাথে আহার করবে। আমি আরয করলাম, এরপর

৪৮. *মুসলিম হা/২৩৩।*
৪৯. *বুখারী হা/৫৯৭৬।*

কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে তোমার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া'।[৫০]

আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ 'সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকো। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেগুলি কি কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে শরীক করা, যাদু করা, আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরী'আতসম্মত কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা। সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করা এবং অবলা-সরলা সতী-সাধ্বী মুমিন মহিলাদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া'।[৫১]

(৪) নাফসে আম্মারা : 'নফস' তিন প্রকার। (ক) নফসে মুত্বমাইন্নাহ-প্রশান্ত হৃদয়। (খ) নফসে লাউয়ামাহ-তিরস্কারকারী আত্মা অর্থাৎ বিবেক এবং (গ) নফসে আম্মারাহ অর্থাৎ অন্যায় কাজে প্ররোচনা দানকারী অন্তর। শেষোক্ত অন্তরটি সর্বদা শয়তানের তাবেদারী করে। এর সঙ্গে সর্বদা লড়াই করেই মুমিনকে হকের উপরে টিকে থাকতে হয়। এ খারাপ নফস মানুষকে সর্বদায় অন্যায় পথের দিকে ডাকে, ধ্বংসের পথে আহ্বান করে। আর এভাবে মানুষের ঈমান কমতে কমতে শূন্য হয়ে যায়। তাই এ খারাপ অন্তর থেকে মহান আল্লাহ্‌র নিকট সর্বদা পরিত্রাণ চাইতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ মিসরের শাসক আযীয-এর স্ত্রী সম্পর্কে বলেন, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 'আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না! নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ। কিন্তু সে নয় আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(ইউসুফ ১২/৫৩)*। আল্লাহ্‌র নিকট সর্বদাই সঠিক পথের থাকার তাওফীক চাইতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হ'তে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন' *(নূর ২৪/২১)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَلَوْلاَ أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيْلاً 'আমরা তোমাকে দৃঢ়পদ না রাখলে তুমি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন' *(ইসরাঈল ১৭/৭৪)*। তাই মানুষ যদি তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হিসাব-নিকাশ করে চলে এবং আল্লাহ প্রদত্ত হুকুম-আহকামের প্রতি লক্ষ্য রাখে, তাহ'লে অন্যায় কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকা সম্ভব। সেই সাথে পরকালের জন্য আমরা কতটুকু আমল করছি সেটা অবশ্যই ভাবার বিষয়। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ 'মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে খবর রাখেন' *(হাশর ৫৯/১৮)*।

আল্লাহ্‌র ইবাদতের মাধ্যমে আত্মাকে জীবিত করতে হবে, ঈমান মযবূত করতে হবে, ঈমান বাড়াতে হবে, প্রশান্ত আত্মা নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে, তাহ'লেই পরকালে শান্তির স্থান জান্নাত লাভ করা যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِيْ عِبَادِيْ، وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ- 'হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে, সন্তুষ্ট চিত্তে ও সন্তোষভাজন অবস্থায়। অতঃপর প্রবেশ কর আমার বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে' *(ফজর ৮৯/২৭-৩০)*।

(৫) শয়তানের অনুসরণ : শয়তান মানব জাতিকে সর্বদা ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকে। এমনকি ছালাতের মাঝেও মানুষকে কুমন্ত্রণা দেওয়ার চেষ্টা করে। ফলে মানুষের ঈমান কমে যায়। তাই মানব জাতির উচিত আল্লাহ্‌র নিকট সর্বদা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকার জন্য পানাহ চাওয়া। কারণ শয়তান মানুষকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوْ حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ 'শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়' *(ফাতির ৩৫/৬)*। শয়তান মানুষের চির শত্রু। মহান আল্লাহ বলেন, قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ 'তিনি বললেন, বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহ'লে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' *(ইউসুফ ১২/৫)*। শয়তানের

---

৫০. *বুখারী হা/৪৪৭৭।*
৫১. *বুখারী হা/২৭৬৬।*

কুমন্ত্রণার কারণে মানুষ বিপথগামী হয়। মহান আল্লাহ বলেন, قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ 'সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব' *(হিজর ১৫/৩৯)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ 'আল্লাহ্র কসম! আমরা আপনার পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর শয়তান তাদের কর্মসমূহকে শোভনীয় করে দেখিয়েছে। আজ সে-ই তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(নাহল ১৬/৬৩)*। তিনি আরো বলেন, 'আমরা তোমার পূর্বেকার সম্প্রদায় সমূহের নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর (তাদের অবিশ্বাসের কারণে) আমরা তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম। যাতে কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহ্র প্রতি বিনীত হয়। যখন তাদের কাছে আমাদের শাস্তি এসে গেল, তখন কেন তারা বিনীত হ'ল না? বরং তাদের অন্তরসমূহ শক্ত হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাজগুলিকে তাদের নিকটে সুশোভিত করে দেখাল' *(আন'আম ৬/৪২-৪৩)*।

শয়তানই মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিমুখ করে। মহান আল্লাহ বলেন, اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ 'শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহ্র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত' *(মুজাদালাহ ৫৮/১৯)*। শয়তানই মানুষকে সরল-সঠিক পথ থেকে বিপথগামী করে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ– 'সে বলল, যে আদমের প্রতি অহংকারের কারণে আপনি আমার মধ্যে পথভ্রষ্টতার সঞ্চার করেছেন, সেই আদম সন্তানদের পথভ্রষ্ট করার জন্য আমি অবশ্যই আপনার সরল পথের উপর বসে থাকব। অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের কাছে আসব তাদের সামনে, পিছনে, ডাইনে, বামে সবদিক থেকে। আর তখন আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না' *(আ'রাফ ৭/১৬-১৭)*।

এজন্য মহান আল্লাহ শয়তানের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন; বরং সর্বদা তার বিরোধিতা করতে বলেছেন। কারণ শয়তানই মানুষের চির দুশমন। মহান আল্লাহ বলেন, يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ أَوْلِيَاء لِلَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ 'হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। যেমন সে তোমাদের আদি পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল। সে তাদের থেকে তাদের পোষাক খুলে নিয়েছিল যাতে সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাতে পারে। সে ও তার দল তোমাদেরকে এমন স্থান থেকে দেখে যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখতে পাও না। আমরা শয়তানকে অবিশ্বাসী লোকদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি' *(আ'রাফ ৭/২৭)*। যে ব্যক্তি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে সে শয়তানেরই সহচর হয়ে যাবে এবং সে ঈমান শূন্য হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُم مُّهْتَدُوْنَ، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ– 'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমরা তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। শয়তানরাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে। অবশেষে যখন সে আমার কাছে আসবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়, আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব থাকত। কত নিকৃষ্ট সঙ্গী সে' *(যুখরুফ ৪৩/৩৬-৩৮)*।

(৬) দুনিয়া ও তার ফিৎনায় পতিত হওয়া : মানুষের ঈমান হ্রাসের ক্ষেত্রে এটি দ্বিতীয় পরোক্ষ কারণ। মানুষ যখন দুনিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং তার জীবনের সব কিছুই দুনিয়াকে ঘিরে আবর্তিত হয় তখনই সে পরকাল বিমুখ হয় এবং আল্লাহ আনুগত্য করা থেকে দূরে সরে যায়। ইবাদত-বন্দেগী করে না এবং হারাম-হালাল কিছু বুঝে না, তখনই তার ঈমান কমে যায়। অতএব যে ব্যক্তি দুনিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকে তার নিকট আল্লাহ্র আনুগত্য করাটা এবং পরকালমুখী হওয়াটা খুব ভারী মনে হয়।[৫২]

এজন্য মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, اعْلَمُوْا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ 'তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়। যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে

৫২. *ইবনুল কাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃঃ ১৮০।*

চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়' *(হাদীদ ৫৭/২০)*। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيْماً تَذْرُوْهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً، الْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً-

'তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা কর। তা পানির ন্যায়, যা আমরা আকাশ থেকে নাযিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল-সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়। অতঃপর তা এমন শুষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ এ সবকিছুর উপর শক্তিমান। ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্যে উত্তম' *(কাহফ ১৮/৪৫-৪৬)*। মানুষের উচিত পরকালের জন্যই বেশী বেশী কাজ করা। কারণ এ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, যার কোন মূল্য নেই। কিন্তু তারা পার্থিব জীবন নিয়েই ব্যস্ত, অথচ ইহকাল পরকালের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগ মাত্র *(রা'দ ১৩/২৬)*। শুধু দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকলে পরকাল হারাতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই তৃপ্ত থাকে ও তার মধ্যেই নিশ্চিন্ত হয় এবং যারা আমাদের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে উদাসীন। এসব লোকদের ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম তাদের কৃতকর্মের কারণে' *(ইউনুস ১০/৭-৮)*। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيْتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيْلٌ-

'হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হ'ল যে, যখন তোমাদের বলা হয় আল্লাহ্র পথে (জিহাদে) বেরিয়ে পড়, তখন তোমরা মাটি আঁকড়ে ধর? তোমরা কি পরকালের বিনিময়ে দুনিয়াবী জীবনের উপর রাযী হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার ভোগবিলাস অতীব নগণ্য' *(তওবা ৯/৩৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ 'আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের ভয় করছি না বরং ভয় করছি যে, তোমাদের উপর দুনিয়া প্রশস্ত করে দেয়া হবে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর যেমন দুনিয়া প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিল। আর তোমরা তা পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করবে, যেমন তারা তা পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করেছিল। আর তা তোমাদেরকে আখিরাত বিমুখ করে ফেলবে, যেমন তাদেরকে আখিরাত বিমুখ করেছিল'।[৫৩]

বাস্তবে যদি আমরা দুনিয়ার দিকে লক্ষ্য করি তাহ'লে বুঝতে পারব যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। এর কোন মূল্য নেই। মানুষ দুনিয়াতে একা এসেছে। আবার তাকে একা চলে যেতে হবে পরকালের স্থায়ী জীবনে। আর পরকালের জীবনই আসল জীবন। তাই যারা পরকালে নাজাত পাবে তারাই সুখময় স্থান জান্নাত লাভ করবে। আর আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবে। অতএব পরকালীন জীবনকে সবার উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى 'অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী' *(আ'লা ৮৭/১৭)*। মানুষের টাকা-পয়সা, গাড়ী-বাড়ী, পরিবার, সন্তান-সন্ততি নিয়ে যতই আরাম-আয়েশে থাকুক না কেন, যদি আমল না থাকে, পরকালের জন্য পাথেয় সঞ্চয় না করতে পারে, তাহ'লে তার জীবনের কোন মূল্য নেই; বরং পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

(৭) অসৎ সঙ্গ : যখন কোন ব্যক্তির সঙ্গী অসৎ হয় তখন তাকেও অসৎ পথে চলার পথ দেখায়। আর সৎ ব্যক্তি সঙ্গী হ'লে তাকেও ভাল পথে চলার জন্য বলে থাকে। ফলে অসৎ সঙ্গী ঈমান কমার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। সুতরাং সৎ নেককার ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করা এবং ভাল মানুষকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা মুমিনের কর্তব্য। যেমন রাসূলুলাহ (ছাঃ) বলেন, الْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِه فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ 'মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে ওঠে। অতএব তোমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত কার সাথে বন্ধুত্ব করবে'।[৫৪]

যে কোন ব্যক্তি বন্ধু নির্বাচন করার পূর্বে অবশ্যই যেন সে লক্ষ্য করে তার দ্বীনের প্রতি, আমানতের প্রতি, আক্বীদার প্রতি। যদি দেখতে পায় যে, তার দ্বীন-ধর্ম, আমানতদারী, সঠিক আক্বীদায় বিশ্বাসী হয় তাহ'লে তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), তাঁর ছাহাবীগণের এবং সালাফে ছালেহীনের প্রতি লক্ষ্য করি। আর তাঁদের মত জীবন গড়ি। পক্ষান্তরে ফেরাউন, নমরূদ, হামানের মত যারা তাদের থেকে সাবধান হই। অতএব যে সৎ ব্যক্তিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে সে তার ফল পাবে। আর যে অসৎ ব্যক্তিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে সে সেদিকেই যাবে যেদিকে তার বন্ধু যাবে।[৫৫]

---

৫৩. *বুখারী হা/৬৪২৫।*
৫৪. *তিরমিযী হা/২৩৭৮; আবুদাঊদ হা/৪৮৩৩; মিশকাত হা/৫০১৯; সিলসিলা ছাহীহাহ, হা/৯২৭।*
৫৫. *আবু সোলায়মান আল-খাত্ত্বাবী, আল-উযলাহ, পৃঃ ৫৬; যিয়াদাতুল ঈমান ওয়া নুকছানিহি, পৃঃ ২৭২।*

নিয়মের রাজত্ব

রফীক আহমাদ*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আল্লাহ্র মহারাজত্বে নিয়মের কোন শেষ নেই এবং তা বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। মানুষ মরণশীল, এজন্যে আল্লাহ তা'আলা 'মৃত্যু' নামে একটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন। যা পৃথিবীর কোন মানুষই দেখতে পায় না। তবে ইহকাল ও পরকালের মধ্যে যে সুদৃঢ় সীমারেখা রয়েছে, মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষকে উক্ত সীমারেখার দরজায় উপস্থিত করা হয়। সুতরাং মৃত্যু মোটেও ক্ষুদ্র বস্তু নয়। মানব জীবনে মৃত্যুর গুরুত্ব অপরিসীম। যারা মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে পৃথিবীতে পদচারণা করে তারা হতভাগ্য। আর যারা মৃত্যুকে স্মরণ করে পৃথিবীতে আল্লাহ্র ভয়ে বিনীত থাকে তারাই ভাগ্যবান।

মৃত্যুর মাধ্যমে পরকালে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি পবিত্র কুরআনে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ– 'পুণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল' *(মুলক ৬৭/১-২)*।

অন্যত্র প্রত্যাদেশ হয়েছে, إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعاً وَعْدَ اللهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَعَذَابٌ أَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ– 'তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য, তিনিই সৃষ্টি করেন প্রথমবার, আবার (মৃত্যুর পর) তৈরী করবেন তাদেরকে বদলা দেয়ার জন্য, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে ইনছাফের সাথে। আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে হবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। এজন্য যে তারা কুফরী করছিল' *(ইউনুস ১০/৪)*। তিনি আরো বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ 'প্রত্যেক প্রাণকে মরণের স্বাদ নিতে হবে, অতঃপর তোমরা আমাদেরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে' *(আনকাবূত ২৯/৫৭)*।

মানুষ মাত্রেই মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ্র হুকুমে, নির্ধারিত সময়ে, নির্ধারিত সময়ের পূর্বেও নয়, পরেও নয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوْتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتَاباً مُّؤَجَّلاً 'আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া কারো মৃত্যু হ'তে পারে না, সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১৪৫)*।

এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন, لِلَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ– 'যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের উদাহরণ নিকৃষ্ট এবং আল্লাহ্র উদাহরণই মহান, তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। যদি আল্লাহ লোকদেরকে তাদের অন্যায় কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূ-পৃষ্ঠে চলমান কোন কিছুকেই ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুত সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মুহূর্ত বিলম্বিত কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না' *(নাহল ১৬/৬০, ৬১)*।

মৃত্যুর তাৎপর্য সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوا شُيُوخاً وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 'তিনিই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। অতঃপর শুক্রবিন্দু দ্বারা, অতঃপর জমাট রক্ত দ্বারা, অতঃপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর, অতঃপর বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কারো কারো এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নির্ধারিত কালে পৌঁছ এবং তোমরা যাতে অনুধাবন কর' *(গাফির/মুমিন ৪০/৬৭)*।

মৃত্যুর এই চিত্রই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। মৃত্যু আল্লাহ্র হুকুম বা একটা বিশেষ ব্যাবস্থা। এখানে শুধু কিছুক্ষণ মানব আত্মাকে অচল করে দেয়া হয় এবং নির্ধারিত সময়ে মৃতদেহে সেই আত্মাকে সংযোজন করা হয়। অতঃপর মানুষের কর্ম অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গৃহীত হয়। মৃত্যু নামে মানব আত্মার এই রূপান্তর কত যে মর্মান্তিক, কত ভয়াবহ, কত হৃদয়বিদারক, কত দুঃখজনক তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। মানব জীবনের সংশোধনের জন্য এটা একটা স্থায়ী ব্যবস্থা।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে একটা নির্ধারিত সময়ের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। শুধু মানুষ নয়; আল্লাহ্র নিয়মের মহারাজত্বে প্রতিটি বস্তুই নির্ধারিত সময়ের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। সে সময় শেষে সবার ধ্বংস (মৃত্যু) অনিবার্য। নভোমণ্ডল ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট বস্তুগুলো প্রধানত জীব ও জড় দু'ভাগে বিভক্ত। জীবের জন্ম-মৃত্যু আছে। কিন্তু জড় বস্তু বিশেষ করে আসমান-যমীন, সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর প্রভৃতির সৃষ্টি কঠিনতর এবং স্থিতিকাল দীর্ঘতম। কিন্তু বিশ্বজগতও নশ্বর। তবে এখানকার বৃহৎ বিপুলায়তন ও বিশালকায় সৃষ্টিগুলো যেমন আমাদের দৃষ্টিতে অসীম ও অনন্ত, তেমনি তাদের বয়সের দীর্ঘতাও

* শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।

অকল্পনীয়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী মানব সম্প্রদায়ের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তবে এটা সত্য যে, এরা আল্লাহ্র ইচ্ছায় এক নির্ধারিত সময়ের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّا أُنذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ– 'নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে সবকিছু আমরা যথাযথভাবে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যেই সৃষ্টি করেছি' *(আহকাফ ৪৬/৩)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَعْلَمُوْنَ ظَاهِراً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ، أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيْراً مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُوْنَ– 'তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না। তারা কি তাদের মনে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে ও নির্ধারিত সময়ের জন্য' *(রূম ৩০/৭-৮)*।

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এদের মধ্যবর্তী সমুদয় সৃষ্টি একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সৃজিত হয়েছে। সুতরাং এগুলো চিরস্থায়ী নয়, বরং অস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী। এরপর চিরস্থায়ী জগত রয়েছে যা পরকাল নামে সুপরিচিত। পৃথিবীর সমুদয় সৃষ্টির নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র আল্লাহ্র সত্তা সমুন্নত, অক্ষয় ও চিরস্থায়ী থাকবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করেন, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ– 'ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র তোমার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার চেহারা ব্যতীত' *(আর-রহমান ৫৫/২৬-২৭)*। অন্যত্র আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে বলেন, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْراً– 'তুমি সেই চিরঞ্জীবের (আল্লাহ্র) উপর ভরসা কর, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা কর' *(ফুরকান ২৫/৫৮)*।

আল্লাহ আরো বলেন, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ 'আল্লাহ্র চেহারা ছাড়া অন্য সবকিছুই ধ্বংস হবে। হুকুম তাঁরই, তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে' *(কাছাছ ২৮/৮৮)*। আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু একটা নির্ধারিত সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সে সময় শেষে এগুলোর ধ্বংস হবে ক্বিয়ামতের মাধ্যমে। 'ক্বিয়ামত' একটি নির্দিষ্ট দিন বা সময়ের নাম। ক্বিয়ামত শব্দের অর্থ প্রলয়ের দিন, ধ্বংসের দিন। এর জন্য একটা সময় নির্ধারিত আছে, মহান আল্লাহ ছাড়া তা কেউ জানে না। ক্বিয়ামতের আগমন একটি আকস্মিক ব্যাপার। ক্বিয়ামতের কথা বোঝাতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীময় কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগের নমুনা রেখে দিয়েছেন। যেমন ভূমিকম্প, সুনামি, হ্যারিকেন, টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি।

ক্বিয়ামতের নির্ধারিত সময় উপস্থিত হ'লেই আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ধ্বংসের জন্য সিঙ্গায় ফুঁক দিতে ইসরাফীল (আঃ)-কে হুকুম দিবেন। ইসরাফীল (আঃ)-এর সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার ফলে ক্বিয়ামতের তাণ্ডবলীলা শুরু হবে।

তৎকালীন অবস্থার বর্ণনা পবিত্র কুরআনে এভাবে এসেছে, إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ، خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ، إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا– 'যখন ক্বিয়ামতের ঘটনা ঘটবে, যার বাস্তবতার কোন সংশয় নেই। এটা কাউকে নীচু করে দেবে, কাউকে সমুন্নত করে দেবে, যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে, অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা' *(ওয়াকি'আহ ৫৬/১-৬)*।

ক্বিয়ামতের আরও কঠিন বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ– 'যখন সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, একটি মাত্র ফুৎকার এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে, সেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে। আটজন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের ঊর্ধ্বে বহণ করবে' *(হাক্কাহ ৬৯/১৩-১৭)*। একই মর্মে ঘোষিত হয়েছে যে, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيْرٌ، عَلَى الْكَافِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ– 'যেদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, সেদিন হবে কঠিন দিন। কাফেরদের জন্য এটা সহজ নয়' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৮-১০)*। সে দিনের ভয়াবহতার বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ– 'যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষত্র সমূহ খসে পড়বে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে এবং যখন কবর সমূহ উন্মোচিত হবে, তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে' *(ইনফিতার ৮২/১-৫)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে ক্বিয়ামতের এক ভয়াল দৃশ্য ফুটে

উঠেছে। মাত্র একটি ফুৎকারেই পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা কত কঠিন বিষয়, কত ভয়ঙ্কর, অচিন্তনীয় ও অবর্ণনীয় বিষয় তা এক পরাক্রমশালী আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

মহান আল্লাহ তাঁর সুবিশাল নিয়মের রাজত্বে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় প্রতিনিধি মানব সৃষ্টি করেন এবং তাকে প্রচুর জ্ঞান দান করেন। এজন্য মানুষের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হ'ল এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করে নেয়া। আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার সুফল এবং আনুগত্য না করার কুফল সম্বন্ধেও বিশদ বিবরণ রয়েছে কুরআনে। মানুষের জীবনকালকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি নির্ধারিত সময়কাল নশ্বর ইহজগত, অপরটি অনির্ধারিত সময়কাল অবিনশ্বর পরজগত। আমরা বর্তমান নশ্বর ইহজগতের অধিবাসী, জন্ম হ'তে মৃত্যু পর্যন্ত এখানে এক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে সুশৃংখল জীবন যাপন করতে হবে। এটা পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র আদেশ। এই আদেশ পালনে রয়েছে তাঁর অনাবিল সন্তুষ্টি এবং (পরকালে) এক মহা পুরস্কার। পক্ষান্তরে এই আদেশ অমান্যকারীরা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিতে নিপতিত হবে এবং পরকালে এক ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে।

কিয়ামতের পরে সকলকে একত্রে সমবেত করা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ، قَالُوْا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ، إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ– 'সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল? রহমান আল্লাহ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য বলেছিলেন। এটা তো হবে কেবল এক মহানাদ। সেই মুহূর্তেই তাদের সবাইকে আমাদের সামনে উপস্থিত করা হবে। আজকের দিনে কারও প্রতি যুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করবে কেবল তারই প্রতিদান পাবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৫১-৫৪)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ أَفْوَاجاً، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَاباً، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً، إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً، لِلْطَّاغِيْنَ مَآباً– 'যে দিন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে। আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে; সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থল রূপে' *(নাবা ৭৮/১৮-২২)*।

তিনি আরো বলেন, يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً، يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً، نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ إِذْ يَقُوْلُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْماً– 'যে দিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন আমরা অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীল চক্ষু অবস্থায়। তারা চুপিসারে পরস্পর বলাবলি করবে, তোমরা মাত্র দশদিন অবস্থান করেছিলে। তারা কি বলে তা আমরা ভালভাবে জানি। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত উত্তম পথের অনুসারী সে বলবে, তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে' *(ত্বোয়া-হা ২০/১০২-১০৪)*।

ক্বিয়ামতের দীর্ঘতা বর্তমান এক দিনের হিসাবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। পৃথিবী ধ্বংসের দিবস 'ক্বিয়ামত'-এর দীর্ঘতা সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন, يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ 'তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন, অতঃপর তা তাঁর কাছে পৌঁছবে এমন একদিনে যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাযার বছরের সমান' *(সাজদাহ ৩২/৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ 'ফেরেশতাগণ ও রূহ আল্লাহ তা'আলার দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন এক দিনে যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাযার বছর' *(মা'আরিজ ৭০/৪)*।

উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে ক্বিয়ামতের দীর্ঘতার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। সময়ের দীর্ঘতা ও স্বল্পতা পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপরই প্রধানত নির্ভরশীল। সেই দিনে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং তাদের কর্মফলের কারণে, সেই দিনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন দলের পক্ষে বিভিন্ন রূপ হবে। কাফেরদের জন্য পঞ্চাশ হাযার বা এক হাযার বছর, মুমিনদের জন্যে এক ছালাতের ওয়াক্তের সমান হবে।

ক্বিয়ামতের পর হাশরের ময়দানে মহাবিচারক আল্লাহ তাঁর বিচার কার্যালয় স্থাপন করবেন। ঐ বিচারালয়ে মানুষের কর্মের বিচার করা হবে। সিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকারের পর মানুষ দলে দলে ঊর্ধ্বশ্বাসে আল্লাহ্‌র দিকে দৌড়াতে থাকবে এবং নিজেদের জন্য নির্ধারিত স্থানে গিয়ে ঠাঁই নিবে। কারণ ঐ সমাবেশ স্থলে মানুষের কর্মফল অনুযায়ী আলাদা আলাদা অবস্থান স্থল নির্ধারিত থাকবে। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হ'ল এজগতে মানুষ যেভাবে প্রত্যেকে নিজ নিজ আবাসস্থল বা বাড়ী-ঘর চেনে, ক্বিয়ামতের ঐ দিনেও সে তার নিজ জায়গা চিনে নিবে।

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ নিজের ভাল-মন্দ বুঝতে পারে, স্বচক্ষেই ভালর শুভ প্রতিদান এবং মন্দের অশুভ প্রতিফল দেখতে পায়। অতঃপর ক্বিয়ামতের দ্বিতীয় সিঙ্গায় ফুৎকারে মানুষ কবর হ'তে যে যেখানে ছিল, সেখান হ'তে উঠে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে এবং সে তার পাপ-পুণ্য

স্বচক্ষে দেখতে পাবে। এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলাই বিচারদিবসের একমাত্র মালিক। তিনি বলেন, مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ 'যিনি বিচার দিবসের মালিক' *(ফাতিহা ১/৩)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتاً 'নিশ্চয়ই বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে' *(নাবা ৭৮/১৭)*। অতঃপর বিচারের জন্য ন্যায়ের মানদণ্ড (দাঁড়িপাল্লা) স্থাপন করা হবে। আল্লাহ বলেন, وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ 'আমরা ক্বিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি যুলুম করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণ হয়, আমরা তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমরাই যথেষ্ট' *(আম্বিয়া ২১/৪৭)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُوْلَـئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِآيَاتِنَا يِظْلِمُوْنَ– 'সেদিন যথার্থই ওযন করা হবে, অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারা সফলকাম হবে এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা তারা আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো' *(আ'রাফ ৭/৮-৯)*।

পার্থিব জগতের ন্যায়-অন্যায়ের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সেদিন প্রতিটি মানুষের সংগৃহীত আমলনামা ওযন করা হবে। এজন্য সেখানে স্থাপিত দাঁড়িপাল্লায় একদিকে ভাল কাজগুলো ও অন্যদিকে মন্দ কাজগুলো তুলে দিয়ে পরিমাপ করা হবে। এতে ভাল কাজের বা নেকীর পাল্লা ভারী হ'লে সে হবে সৌভাগ্যবান, আর মন্দ কাজ বা পাপের পাল্লা ভারী হ'লে সে হবে দুর্ভাগা।

ক্বিয়ামতের দিন বিচার হবে শুধু জিন-ইনসানের অন্য কোন প্রাণী বা জড়বস্তুরও নয়। কারণ তারা সবাই সর্বদা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত থাকত এবং আল্লাহ্র শেখানো পদ্ধতিতে তাঁর ইবাদত করত, সিজদা করত। অর্থাৎ সবাই তাঁর আদেশ পালন করত। কাজেই আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে অতি সহজে তাদের বিচার-ফায়ছালা করবেন। কিন্তু জিন ও মানুষের মধ্যে সবাই আল্লাহ্র আদেশ পালন করে না। তাই তাদের কর্ম অনুযায়ী বিচার হবে, সবার পাপ-পুণ্য দাঁড়িপাল্লায় পরিমাপ করা হবে এবং সত্য ও ন্যায়ভিত্তিক ওযন হবে। প্রত্যেকটি মানুষ নিজ নিজ হিসাব পুরোপুরি বুঝবে, তাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না।

উল্লেখ্য, মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী ও জড়বস্তুর কোন শত্রু ছিল না। এজন্যে তারা স্বচ্ছতায় বহাল ছিল। কিন্তু মানুষের শত্রু শয়তান মানুষের শিরা উপ-শিরায় প্রবেশ করে তাকে পাপাচার করতে প্ররোচিত ও প্রভাবিত করত। যারা বুদ্ধিমান, ধর্মভীরু ও আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী তারা তা বুঝত এবং তাদের অন্তরে তা ঠাঁই পেত না। কিন্তু যারা আল্লাহ্র প্রতি অবিশ্বাসী তারা বিপথগামী হয়ে ভ্রান্ত পথে যাত্রা করত। এজন্য জান্নাতে প্রবেশকারী বা ক্বিয়ামতের বিচারে বিজয়ীদের একটা বিশেষ পরিচয় দিয়ে আল্লাহ বলেন, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغَاوِيْنَ– 'সে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু যে শুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহ্র কাছে আসবে (সে কৃতকার্য হবে)। জান্নাত আল্লাহভীরুদের নিকটবর্তী করা হবে এবং বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম' *(শো'আরা ২৬/৮৮-৯১)*।

মানুষের মধ্যে স্বচ্ছ মনের অধিকারীরা আল্লাহ্র প্রিয় পাত্র। তাই তাদের উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেন, يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ، وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ– 'হে প্রশস্ত মন! তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' *(ফজর ৮৯/২৭-৩০)*।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের উদ্দেশ্যে বহু সুসংবাদ ও সতর্কবাণী প্রেরণ করেছেন সেগুলি মেনে চলে পরকালে মুক্তি লাভের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথা তাদের ব্যর্থতার কথাও বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তা দ্বারা বিবেচনা করে না। তাদের চোখ রয়েছে, তা দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*।

আল্লাহ্র অবাধ্য ও পাপী লোকর সম্পর্কে বলা হয়েছে 'যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশ সমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্র সামনে পেশ হবে, তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে। যাতে আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। এটা মানুষের একটা সংবাদনামা এবং যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই একক এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে' *(ইবরাহীম ১৪/৪৮-৫২)*।

আল্লাহ্র রাজত্বে তাঁর নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই, এটা বোঝাবার জন্যই তাঁর প্রয়াস প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তাঁর মহাশক্তির বাস্তব নমুনা আকস্মিকভাবে অবতীর্ণ হয় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের অজ্ঞাতসারে। এগুলোর ধ্বংস ইতিহাস খুবই ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক। এগুলোও আল্লাহ্র

Contents

নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংস কাহিনীগুলো মানুষের জন্য বিশেষ স্মরণীয়। আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ও তাঁর আদেশ পালনের জন্যেই এগুলোর অবতারণা।

এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর নিকটে আত্মসমর্পণ করলেই তাঁর নিয়মের রাজত্বের প্রতিও গভীর বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া সম্ভব, অন্যথা নয়। কারণ যারা সত্যিকারভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি বা তাঁর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসী তারাই আল্লাহ প্রদত্ত নিয়মপ্রণালী অনুযায়ী কাজ করবে এবং সেটাই হবে সঠিক কাজ। এরা শুধু পৃথিবীতে নিরঙ্কুশ শান্তি প্রতিষ্ঠার ও সঠিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে। এরাই হবে আল্লাহ্‌র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পক্ষান্তরে যারা শয়তানের প্ররোচনা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্দেহ পোষণ করে, অন্য কোন কিছুকেও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করে বিশ্বাস করবে ও তাঁর ইবাদত করবে। তারা বিশ্বাসীদেরকে তাদের দলে নেওয়ার চেষ্টা করবে, সম্ভব হ'লে অন্যায়-অত্যাচারও করবে। দেশে দেশে অশান্তির বীজ বপণ করে সন্ত্রাস, খুন, গুম, ধর্ষণ, অপহরণ, ছিনতাই, বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাচার দ্বারা পৃথিবীর শান্তি বিনষ্ট করবে। এরা আল্লাহ্‌র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার অযোগ্য বলে গণ্য হবে।

উপরোক্ত দু'টি দলই প্রধানত ক্বিয়ামতের দিন চূড়ান্ত বিচারের সম্মুখীন হবে। হাশরের ময়দান তো মানুষের জন্য বিচারালয় হিসাবে স্থাপিত হবে। এটা আল্লাহ্‌র বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য হবে আশীর্বাদ এবং অবিশ্বাসী বান্দাদের জন্য হবে চরম অভিশাপ। আল্লাহ্‌র নিয়মের রাজত্বে যাবতীয় নিয়মের মধ্যে ক্বিয়ামত দিবসের বিষয় কঠিন ও কল্পনাতীত। সকল মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করাই এ দিবসের প্রতিপাদ্য।

আলোচ্য প্রবন্ধে বর্ণিত সৃষ্টির ইতিহাস, মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ অতঃপর পৃথিবীর সমাপ্তি এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধ্বংসকাহিনী নিয়মের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর হাশরের ময়দানে পৃথিবীর আদি হ'তে অন্ত পর্যন্ত মানুষের বিচার, আল্লাহ্‌র ক্ষমতার বর্ণনা মানুষের জন্য কত বিস্ময়ের ও ভীতির বিষয় তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। এগুলোর প্রতি বিশ্বাস তথা মহান আল্লাহ্‌র এই মহাপরিকল্পনার প্রতি বিশ্বাসী হওয়াই আল্লাহ্‌র পক্ষ অবলম্বনের এবং আশ্রয় লাভের পথ। যার শেষ প্রান্তে রয়েছে পরকালের উত্তম আবাসগৃহ জান্নাত। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ, জীবনের স্থায়ীত্বকাল, কবরের অবস্থান, পৃথিবীর ধ্বংসকাহিনী, হাশরের ময়দানের বিচার ব্যবস্থার আয়োজন আল্লাহ্‌র অলৌকিক ক্ষমতার মহাপ্রদর্শন প্রভৃতির প্রতি অবিশ্বাস আল্লাহ্‌র বিপক্ষ অবলম্বনের পথ, যার শেষ প্রান্তে রয়েছে পরকালের নিকৃষ্ট চিরস্থায়ী আবাসগৃহ জাহান্নাম।

বস্তুতঃ দুনিয়ার হিসাবের সমাপ্ত হ'লেই পৃথিবীর ধ্বংসাদেশ দেয়া হবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত বিধান মতে সকল মানুষকে ক্বিয়ামত বা হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে বিচারের জন্য। বিচারের পর প্রত্যেকেই পরকালের নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে যাবে। মানুষ পরকালের ঠিকানায় পৌঁছে দেখবে এক নতুন জগতের নতুন আবাসগৃহ জান্নাত অথবা জাহান্নাম। পৃথিবীর সব কথাই মানুষের মনে থাকবে। যারা জান্নাতে যাবে তাদেরও পৃথিবীর ভাল-মন্দ সব কাজ মনের মধ্যে ভীড় জমাবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আর যারা জাহান্নামে যাবে তারাও নিজেদের দোষ সমূহ এবং তার ইন্ধনদাতাদের স্মরণ করবে বা সন্ধান করবে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না, তখন শুধু দুঃখ-কষ্ট আর অনুতাপই হবে।

সৃষ্টির সূচনা হ'তে লয় পর্যন্ত সুদীর্ঘ হাযার হাযার বছর সময়ের কর্মকাণ্ডের হিসাবের আল্লাহ্‌র নিয়মের রাজত্বের এক দিক সমাপ্ত। শুরু হবে অনন্তকালের রাজত্ব। সেটাই পরকাল। আমরা সকলেই আল্লাহ্‌র সেই রাজত্বে শান্তি-সুখে থাকতে চাই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন-আমীন!

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

দারুল হাদীছ একাডেমী
(আবাসিক/অনাবাসিক)
বাংলাবাজার, বড় দেওভোগ, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৯৮৯ ৬৯৯৮১৮, ০১৬৮৯ ৮৮৭৪৯০

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
হেফয ও প্লে থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত

আমাদের আহবান
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ
সম্মানিত দ্বীনি ভাই! ইসলামী আক্বীদা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন ভবিষ্যত বংশধরদের গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে রাজধানী ঢাকার অদূরে বাণিজ্য নগরী নারায়ণগঞ্জে **'দারুল হাদীছ একাডেমী'** পরিচালিত হচ্ছে। বিশুদ্ধ আক্বীদা সম্পন্ন সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠায় একটি অনন্য ইসলামী শিক্ষা উপহার দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। অতএব আপনার সন্তানকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে একজন খাঁটি মুসলিম হিসাবে গড়ে তুলুন।

আমরা যা করতে চাই :
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- নিজস্ব সিলেবাসে পাঠদানের ব্যবস্থা।
- বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত ও হিফযের ব্যবস্থা।
- বাছাইকৃত হাদীছ মুখস্থ করানো।
- কম্পিউটার শিক্ষা ও ব্যবহারে অভ্যস্ত করা।
- আরবী ও ইংরেজী ভাষায় ব্যবহারিক দক্ষতা সৃষ্টি।
- বৃত্তি ও সমাপনী পরীক্ষার জন্য বিশেষ তত্ত্বাবধান।
- উপস্থিত বক্তৃতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন।
- অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের জন্য কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা।

এনজিওর ক্ষুদ্র ঋণে মরণদশা

দেশে প্রাচীন কাবুলিওয়ালাদের নয়া সংস্করণ 'এনজিও'র ক্ষুদ্রঋণ ব্যবসার বেড়াজালে আটকে গেছে গ্রামগঞ্জের নারী-পুরুষ। 'গরিবী হটাও' আর 'স্বাবলম্বী'র নামে বিদেশী টাকায় শত শত এনজিও মাকড়সার জালের মতো সারাদেশে ক্ষুদ্রঋণের জাল ছড়িয়ে দিয়েছে। এ ঋণের জালে আটকে গেছে লাখ লাখ অসহায় নারী-পুরুষ। নারী স্বাবলম্বী এবং আত্ম কর্মসংস্থানের নামে এনজিওগুলো গ্রামের মানুষের মধ্যে ঋণ বিতরণ করেছে। চড়া সূদে সে ঋণের সাপ্তাহিক কিস্তির যোগান দিতে গিয়ে বিপর্যয়কর অবস্থায় পড়ছে ঋণ গ্রহীতারা।

স্বাবলম্বী হওয়া তো দূরের কথা ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে গিয়ে ভিটা-মাটি, ঘটি-বাটি, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী বিক্রি করতে হচ্ছে। ঋণের কিস্তির যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে আত্মহত্যা এবং কিডনী বিক্রির ঘটনাও ঘটেছে। এমনকি বংশ পরম্পরায় ক্ষুদ্রঋণের সূদের ঘানি টানতে হচ্ছে। ঋণের কিস্তি নিয়ে বিরোধে পারিবারিক অশান্তি, সামাজিক অবক্ষয় এবং ঘর-সংসার ভেঙে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে।

সম্প্রতি বগুড়ার ধনুটের গোসাইবাড়ী ইউনিয়নের যমুনার চরের কয়েকজন ঋণ গ্রহীতা জানান, কাজ নেই, ঘরে খাবার নেই, ছেলেমেয়ে নিয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে থাকতে হয়। তারপরও কিস্তির জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে। ফলে এনজিও'র মাঠকর্মীদের দেখলেই তারা বাড়ি থেকে পালিয়ে থাকতে বাধ্য হন।

জয়পুরহাট যেলার কালাই গ্রামের আখতার আলম নামের এক ব্যক্তি এনজিও'র ঋণের কিস্তি নিয়মিত দিতে পারেনি। অতঃপর একপর্যায়ে ঋণের দায় মেটাতে কিডনী বিক্রি করেছে। কালাই গ্রামেরই আরেক বাসিন্দা মুকাররম হোসাইনও ক্ষুদ্রঋণের চক্করে পড়ে কিডনী বিক্রি করেছে।

রংপুর, দিনাজপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, জয়পুরহাট, পাবনাসহ ২০/২২টি যেলার শতাধিক গ্রামের অভিন্ন চিত্র জানা গেছে। গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা, ব্রাক, আশার মতো বড় বড় এনজিও ছাড়াও যেলা-উপযেলা পর্যায়ে ও স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এনজিও জনগণের ভাগ্যের উন্নয়নের নামে ক্ষুদ্রঋণ দানের চটকদার ব্যবসায় নেমে পড়েছে।

রংপুরের কাউনিয়ার আছিয়া খাতুন জানান, তার মা গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন আশির দশকে। মা মারা যাওয়ার পর ঋণের কিস্তি সে চালিয়েছিল। এখন নিজে কাজকর্ম করতে পারেন না। এখন সে কিস্তি চালায় তার ছেলে।

বগুড়া সারিয়াকান্দির এক মাদরাসার অধ্যক্ষ লুৎফর রহমান জানান, দারিদ্র্য বিমোচনের নামে এনজিওগুলো কার্যত গরীব মানুষকে ঋণের ফাঁদে ফেলে দিয়েছে। যারা এনজিও থেকে ঋণ নিয়েছেন তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই যেন হয়ে গেছে কিস্তি পরিশোধ করা। বছরের পর বছর কিস্তি দিয়েও তারা ঋণের জাল থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না।

ওমর আলী নামের এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী জানান, ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগী পালন, কুটিরশিল্প, রবিশস্য ফলানো সবকিছুতেই এনজিওগুলোর পক্ষ থেকে ঋণ দেয়া হয়। সে ঋণের সূদ নেয়া হয় শতকরা ৩০ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গরিবী হটানোর নামে বিদেশ থেকে টাকা এনে কোন কোন এনজিও শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত সূদ আদায় করে থাকে। উত্তরাঞ্চলের গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে এমন এনজিওর সন্ধানও পাওয়া গেছে যারা শতভাগও সূদ আদায় করছে। তাদের আদায়ের পদ্ধতিও অদ্ভূত।

রংপুরে, লালমণিরহাট, গাইবান্ধা প্রভৃতি যেলার বিভিন্ন গ্রামের ঋণ গ্রহীতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, অনেক গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকাসহ কয়েকটি এনজিও ঋণ নেয়ার পরের সপ্তাহ থেকে কিস্তি আদায় শুরু করে। আর ফসল ভালো না হ'লে ঋণগ্রহীতাকে ঘরের গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী, ঘটি-বাটি বিক্রি করে সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। যখন তাতেও কুলায় না তখন ভিটা-মাটি ও ঘর বিক্রি করতে হয়। এমনও বহু ঘটনা ঘটেছে যে কিস্তি আদায়কারীরা ঋণের দায়ে ঋণ গ্রহীতার ঘর ভেঙে নিয়ে গেছে। এ বীভৎসতায় আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে।

এনজিওর ঋণ গ্রহীতাদের অধিকাংশই ঋণের দায়ে অতিষ্ঠ। তারা এ জাল থেকে বের হয়ে আসতে চায়। কিন্তু এনজিওগুলির কৌশলী তৎপরতায় তারা কোনভাবেই এ জাল থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না।

উল্লেখ্য, ৭০-৮০-এর দশকে বিশ্বের ধনী দেশগুলোর মানবদরদীরা এদেশের অসহায় মানুষের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে এবং অক্সফাম, ডানিডা, খ্রিস্টান সোসাইটিসহ কয়েকটি এনজিও'র মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জের অসহায় এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে সহায়তা দিতে থাকে। কিন্তু এভাবে চাহিদা না মেটায় পরবর্তীতে তা বেসরকারী পর্যায়ে এনজিও'র মাধ্যমে পরিচালিত হ'তে শুরু করে। শর্ত ছিল তারা অসহায় গরীবদের না লাভ-না লোকসানের ভিত্তিতে ঋণ ও সহায়তা দিবে। তখন থেকেই ধনী দেশগুলোর সরকার ও বেসরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠান তাদেরকে অকাতরে অর্থ দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের গরীব মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে পুঁজি করে এনজিওগুলো এখন দাদন ব্যবসায় নেমে পড়েছে। একদিকে তারা গরীবের জন্য বিদেশ থেকে আনা অর্থে দামি গাড়ি-বাড়ী, অট্টালিকার মালিক হচ্ছে; অন্যদিকে গরীবদের ক্ষুদ্রঋণের ফাঁদে ফেলে নিজেরা সম্পদের পাহাড় গড়ছে। অথচ ক্ষুদ্রঋণের জালে আটকে অবর্ণনীয় দুর্দশায় পড়েছে গ্রামের দরিদ্র মানুষ।

এদিকে সরকার এসব বিষয়ে একেবারেই নির্বিকার। স্বাধীনতার পর থেকে যে সরকারই ক্ষমতাসীন হয়েছেন, কারোরই এ বিষয়ে সামান্য কোন মাথাব্যথা লক্ষ্য করা যায়নি।

(সংকলিত)।

বালাকোটের রণাঙ্গণে

আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব*

(আগষ্ট সংখ্যার পর)

৪

পরদিন ফজরের ছালাত পড়ে মসজিদ থেকে ফিরছি। দিনের আলো কেবল ফুটতে শুরু করেছে। পূর্বদিকে ঘন জমাট আঁধার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গগণচুম্বী পাহাড়ের ঠিক মাথার উপর আটকে আছে বাঁকা চাঁদ, রহস্যময় ক্ষীণ আলো নিয়ে। চলতি পথে হঠাৎ যেন বাঁধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। একরাশ বিস্ময় নিয়ে থমকে দাঁড়ালাম আমিও। এমন মোহময় দৃশ্য তো হাতছাড়া করা যায় না। অনেক কায়দা-কসরৎ করে দৃশ্যপটটি স্থায়ী করে রাখতে চাইলাম ডিজিটাল যন্ত্রটা দিয়ে। পারলাম না। জানি আল্লাহ্‌র দুনিয়ার এই অকৃত্রিম সৌন্দর্যের উপর কখনও যন্ত্র দিয়ে দখলদারিত্ব কায়েম করা যায় না। তবু ব্যর্থ চেষ্টা চালালাম। এ ব্যর্থতার মাঝে কোন আফসোসের জায়গা নেই। আছে কেবল ঘোরলাগা মুগ্ধতা আর আল্লাহর প্রশংসায় আনত হৃদয়-মন। আল্লাহু আকবার কাবীরা!

কুনহার নদীর পাড় ঘেঁষে কতক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে ঘরে ফিরলাম। তারপর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমে চোখ একটু জুড়িয়ে আসতেই যাহেদ ভাই উপস্থিত। সকালে একটু আগেভাগে আসার জন্য বলেছিলাম। ঠিক ঠিক এসেছেন। প্রস্তুত হয়ে বের হ'লাম সাতসকালে বালাকোটের জীবনযাত্রা দেখার জন্য। বাযারে ঢুকে প্রথমে তিনি সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)-এর কবরের কাছে নিয়ে গেলেন। আমি বললাম, গতকাল একবার তো যিয়ারত করেছি। এবার চলুন নদীর ওপারের গ্রামে। তিনি বললেন, গতকাল এসেছিলেন? আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন আপনার সাথেই এলাম না? তিনি ভ্রু কুঁচকে বললেন, কই না তো? ভারি বিপদ! তার চেহারার দিকে ভাল করে তাকালাম। বললাম, আপনি যাহেদ ভাই না? তিনি বললেন, না, আমি তো শাহেদ! শাহেদ মানে? খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুঝতে পারলাম ভুলটা। যাহেদ ভাই ও শাহেদ ভাই দু'জনের চেহারার মধ্যে খুবই মিল এবং পরস্পর চাচাতো ভাই। আমি ভেবেছিলাম, তিনি যাহেদ ভাই, যার সাথে গতকাল ঘুরেছিলাম। আজ উনি নিজে না এসে চাচাতো ভাইকে পাঠিয়েছেন। প্রকৃত বিষয়টি বুঝতে পেরে দু'জনই খুব হাসলাম। গতদিন উভয়ের সাথেই পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু চেহারার এতটা সাদৃশ্য খেয়াল করিনি।

কাঠের ঝুলন্ত ব্রিজটা পার হয়ে নদীর ওপারের গ্রামে ঢুকলাম। দূর থেকে দেখে পাহাড়ের গায়ে বাড়ী-ঘর খুব ঘিঞ্জি হয়ে সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে উপরে উঠে গেছে মনে হয়। কিন্তু ভিতরে ঢোকার পর বাস্তবে সেরকম দেখা যায় না। যথেষ্ট সমতলভূমি রয়েছে এবং বাড়ী-ঘরের ঘনত্বও তেমন নয়, যেমনটা দূর থেকে মনে হয়। স্কুল-কলেজ, মাদরাসা সবই গড়ে উঠেছে এর মধ্যে। ফসলের ক্ষেত রয়েছে। রয়েছে আলাদা আলাদা সব পাড়া। একটি পাড়ায় ঢুকে যাহেদ ভাইয়ের বাড়ীতে গেলাম। নির্মাণাধীন নতুন দো'তলা বাড়ী। ২০০৫ সালের ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়েছিল। সরকারী অনুদানে আবার তৈরী করছেন। বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই একসাথে থাকেন। সকালের নাস্তা তার বাসাতেই সারলাম। শাহেদ ভাইয়ের ২ বাচ্চা, ছোট ভাই এবং আব্বার সাথে দেখা হ'ল। সত্যি বলতে কি এটুকু মেহমানদারীতে নিজেকে বেশ ভাগ্যবানই মনে হ'ল। তার কারণ পাকিস্তানে আসার পর কারও বাড়িতে নিছক ভদ্রতা ছাড়া সত্যিকার আমন্ত্রণ পেয়েছি এমন ঘটনা বিরল। যত অন্তরঙ্গ বন্ধুই হোক না কেন, এরা সাধারণতঃ কাউকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে যেতে চায় না। এমনকি ঈদের সময়ও না। হোটেলে হোটেলেই মেহমানদারীর কাজ সারে। এখানকার বাংলাদেশীদের কাছে আগেই শুনেছিলাম, এদের এমন কালচারের কথা। কিন্তু মন থেকে বিশ্বাস করিনি। যার খেসারত দিতে হয়েছে রামাযান এবং কুরবানীর ঈদের সময়। সে করুণ অভিজ্ঞতার কথা পরে কোন এক সুযোগে বলা যাবে।

শাহেদ ভাইয়ের বাড়ী থেকে বের হয়ে একটা চাঁদের গাড়িতে চড়ে রওয়ানা হ'লাম কুনহার নদীর পূর্ব পাড়ের রাস্তা ধরে। গন্তব্য লোহারনারা গ্রাম। এখানে কয়েকটি পরিবার রয়েছে আহলেহাদীছ এবং ২০০৬ সালে একটি ওয়াক্তিয়া মসজিদ নির্মিত হয়েছে 'মসজিদে খালিদ বিন ওয়ালিদ'। অন্য দু'টি আহলেহাদীছ মসজিদ শহরের মধ্যে হ'লেও এই মসজিদটি গ্রামের মধ্যে বেশ ভিতরে। শাহেদ ভাই ঐ মসজিদটি দেখানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। মসজিদে পৌঁছে ভিতরে ঢুকলাম। ইমাম ছাহেব মুহাম্মাদ ইয়াসির হাক্কানী (৩০) ছিলেন মসজিদেই। তার রুমেই বসা হ'ল। পরিচয়পর্বের পর মসজিদ সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি জানালেন, মসজিদটি ২০০৬ সালে নির্মিত হয়েছে স্থানীয় আহলেহাদীছদের উদ্যোগে। এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হাজী বাশারাত (৭০) আগে থেকেই আহলেহাদীছ আক্বীদা সম্পর্কে জানতেন। পরবর্তীতে দেওবন্দী আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন ছফদর ওকাড়ভী এবং আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা কাযী আব্দুর রশীদের মধ্যে গুজরানওয়ালায় অনুষ্ঠিত একটি মুনাযারার ভিডিও দেখার পর তিনি আহলেহাদীছ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মুনাযারাটি ছিল 'রাফউল ইয়াদায়েন'-এর উপর। তিনি তাঁর সন্তানদেরকেও ভিডিওটি দেখান। এক পর্যায়ে তাঁর ৪ ভাই সহ পরিবারের সকলেই আহলেহাদীছ হয়ে যান। তাদের উদ্যোগেই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। মুছল্লী অবশ্য বেশী নয়। ১৫ জনের মত। তবে ধীরে ধীরে সংখ্যা বাড়ছে। জুম'আ এখনও চালু হয়নি। মাসখানেক আগে মসজিদের নতুন বিল্ডিং নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। নির্মাণকাজ সমাপ্ত হ'লে জুম'আ শুরু হবে। মসজিদের

* *এমএস (হাদীছ), ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।*

পশ্চিমদিকে নবনির্মিত মসজিদটি দেখতে গেলাম। নির্মাণকাজের সার্বিক দেখভাল করছেন মুযাফফরাবাদের এক মাদরাসার শিক্ষক ওহীদুর রহমান (৩২)। তিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জানালেন স্থানীয় অনুদান এবং মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছের পৃষ্ঠপোষকতায় মসজিদটি নির্মাণ করা হচ্ছে। ইমাম ছাহেব মূলতঃ এ্যাবোটাবাদের অধিবাসী। জামে'আ মুহাম্মাদিয়া সালাফিইয়াহ গুজরানওয়ালা থেকে ফারেগ। কথা প্রসঙ্গে বললেন, তার জানা মতে এ্যাবোটাবাদ শহরে এখন কমপক্ষে ৫টি আহলেহাদীছ মসজিদ এবং ১টি মাদরাসা আছে। আর মানসেহরাতেও ৪টি মসজিদ এবং ১টি মাদরাসা রয়েছে। বালাকোটে আপাততঃ আহলেহাদীছ মসজিদ ৩টি। আর শহরের বাইরে বালাকোট থেকে নারান ভ্যালির পথে প্রায় ২০ কি.মি. দূরে কাওয়াই নামক স্থানে একটি ছোট্ট হিফয মাদরাসা চালাচ্ছেন জনৈক হাফেয আদেল (৫০)। তিনিও একজন নব-আহলেহাদীছ। হয়ত সেখানেও কিছুদিনের মধ্যে একটি মসজিদ নির্মিত হবে। তারা দাবী করলেন, বালাকোট শহরে অন্ততঃ ৫০টি আহলেহাদীছ পরিবার রয়েছে। যাদের মোট সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪০০-এর মত। আর পুরো বালাকোট তহসিলে ১০০০-এরও উপরে আহলেহাদীছ রয়েছে। তাছাড়া প্রতিদিনই সংখ্যাটা বাড়ছে। ফলে প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করা মুশকিল।

চা-নাস্তা করে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার বের হ'লাম শহরে ফেরার জন্য। বালাকোট ব্রীজের পার্শ্বেই 'জামে মসজিদ শুহাদায়ে আহলেহাদীছ'। বালাকোটের প্রথম আহলেহাদীছ মসজিদ (নির্মাণকাল : ১৯৮৩ ইং)। মসজিদের ভিতরে ঢুকে প্রথমে সন্তুষ্ট হ'তে পারিনি নড়বড়ে দশা দেখে। তখনও জানতাম না ২০০৫ সালে মূল মসজিদটি ধ্বংস হওয়ার পর এটি অস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মসজিদের ভিতরে-বাইরে নানা শ্লোগান লেখা। একটি শ্লোগান দেখে ভাল লাগল, 'আহলেহাদীছ কি দো উছূল, আতীউল্লাহ ওয়া আত্বীউর রাসূল'। মসজিদের খাদেম বশীর হোসাইনের সাথে গেটেই দেখা হ'ল। জানা গেল মসজিদের খত্বীব জনাব মুহাম্মাদ ছিদ্দীক মুযাফফরাবাদী (৬২) ভিতরেই আছেন। তিনি বর্তমানে ট্যাক্সিলা ওয়াহ ক্যান্টনমেন্ট এরিয়ায় পরিবারসহ থাকেন। সাধারণতঃ শুক্রবার ছাড়া আসেন না। আজ শনিবার। কোন বিশেষ কাজে এসেছেন। তার টয়োটা প্রাইভেট কারটি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। রওনা হবেন কিছুক্ষণের মধ্যে। সে সময়ই তাঁর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ। ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হবে। মসজিদের পাশে পুরোনো কয়েকটি কামরা। মাওলানা ছিদ্দীকের পুরনো আবাস। এখন কেউ থাকে না। তিনি সপ্তাহে একবার এসে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন এখানে। সেই বাড়ির বারান্দায় চেয়ার পেতে বসলাম আমরা। বাঙালী পরিচয় পেয়ে মুরব্বী খুব খুশী হ'লেন। খাদেমকে নাস্তাপানি আনার জন্য তোড়জোড় করলেন। কাশ্মীরী মানুষ। মধ্যম গড়ন। টকটকে গৌরবর্ণ আর সফেদ দাড়িতে অন্য রকম সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় যে পা দিয়েছেন বেশ আগে, তা এমনিতেই বোঝা যায়। বর্তমানে তিনি মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের একজন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য এবং কেপিকে'র নায়েবে আমীর।

কিছুক্ষণ কথা বলতেই বুঝলাম, মুরব্বী গাম্ভীর্য বজায় রাখলেও যথেষ্ট আলাপী। ভিতরে অনেক কথা জমা আছে তাঁর। মনে মনে ভাবলাম, 'আত-তাহরীকে'র জন্য একটা সাক্ষাৎকার নিতে পারলে মন্দ হয় না। প্রস্তাব দিলাম। তিনি ঘড়িতে যোহরের সময় তখনও অনেকটা বাকী আছে দেখে সাগ্রহে রাযী হ'লেন। মোবাইলের রেকর্ড অপশন চালু করে খাতা-কলম বের করলাম।[৫৬] তিনি রূপকথার বুড়ো গল্পকথকের মত থেমে থেমে কখনও চোখ বুঁজে, কখনও উদাস শুন্য চোখে নিজের জীবনের গল্প শোনাতে লাগলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত আমরা তাঁর গল্প শুনতে লাগলাম। ঘন্টা পার হয়ে একসময় মোবাইলের রেকর্ড অপশন আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে গেল। তবুও গল্প শেষ হয় না। নিজ হাতে গড়ে তোলা যে মসজিদটি ২০০৫ সালে বিধ্বস্ত হয়েছিল, সেটির একটি বড় বাঁধানো ছবি ঘরের ভিতর থেকে বের করে আনলেন। গভীর আগ্রহের সাথে সেটা দেখালেন আমাদের। শোনালেন ভবিষ্যতের নানা পরিকল্পনা। বর্তমান প্রজন্মের আহলেহাদীছদের প্রতি কিছুটা অনুযোগ প্রকাশ করলেন, তাদের অস্থির মনোভাবাপন্ন আচরণের কারণে। তিনি বললেন, 'আমাদের অনেকেই বুঝতে চায় না যে, একজন মানুষের দীর্ঘদিনের আচরিত আক্বীদা-আমল পরিবর্তন করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। ফলে তাঁরা অসহিষ্ণু হয়ে মানুষের সাথে উগ্র আচরণ করে বসছে। অথচ দাওয়াতী ময়দানে ধৈর্যশীল হওয়ার কোন বিকল্প নেই। অন্যদিকে বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণেও অনেক যুবক চরমপন্থী হয়ে উঠছে। তবে এটাও মূলতঃ ধৈর্যহীনতার ফল। আমাদেরকে বুঝতে হবে, মুসলিম উম্মাহর উপর দিয়ে যে বিপর্যয় অতিবাহিত হচ্ছে, তা নতুন নয়। এর চেয়ে অনেক বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে আমাদের। সুতরাং আল্লাহর সাহায্যের উপর গভীর আস্থা রেখে ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। হকপন্থী আলেমদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে হবে। নিজেদের ইচ্ছা মত পথ চলার চিন্তা পরিত্যাগ করতে হবে। নতুবা এ পরিস্থিতির উত্তরণ তো হবেই না, বরং আরো বড় বিপর্যয় নেমে আসবে'। তাঁর এই চিন্তাধারা আমাদের সাথে মিলে যেতে দেখে খুব ভাল লাগল। কথাগুলো যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তা সাক্ষ্য দিচ্ছে চরমপন্থীদের উত্থানে বিপর্যস্ত মুসলিম দেশগুলো। প্রায় ঘন্টা দেড়েক পর তাঁর কাছে বিদায় চাইলাম। উনি ঘাড়ে হাত রেখে অনেক দো'আ করলেন এবং বাংলাদেশী ভাইদের জন্য আন্তরিক ভালবাসা এবং শুভকামনা প্রকাশ করলেন।

---

৫৬. সাক্ষাৎকারটি মাসিক আত-তাহরীক জুন ২০১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

তারপর মসজিদ থেকে বের হয়ে একটু পশ্চিমে সেই বৃদ্ধ হাজী বাশারত ছাহেবের দেখা পেলাম যিনি লোহারনারাতে নতুন মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে তাঁর একটা স্টেশনারীর দোকান আছে। সেই দোকানে বসেই তাঁর সাথে কিছুক্ষণ কথা বললাম। তারপর সেখান থেকে বের হয়ে মাদানী প্লাজা শপিং সেন্টারে ঢুকলাম। আরো কয়েকজন আহলেহাদীছ ভাইয়ের সাথে দেখা হ'ল বেশ কয়েকটি দোকানে। শাহেদ ভাই পরিচয় করিয়ে দিলেন সবার সাথে। চা-এর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে হ'ল সব জায়গাতেই। ২য় তলার সম্মুখভাগে সরকারী হাসপাতালের দন্ত চিকিৎসক ডাঃ শাফকাত হোসাইনের প্রাইভেট চেম্বার। তিনি চেয়ার থেকে উঠে জোর করে তাঁর চেয়ারে আমাকে বসিয়ে দিয়ে একজন রোগী দেখতে লাগলেন। তারপর নাশতা-পানি আনিয়ে নিজের আহলেহাদীছ হওয়ার গল্প বললেন। কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ করে বেরিয়ে আসলাম।

সবশেষে এহসান এলাহী যহীর ভাইয়ের কম্পিউটারের দোকানে গেলাম। আজই যোহরের পর চলে যেতে চাইছি শুনে তিনি বললেন, আজকে যাওয়া যাবে না, থেকে যান। কাল রবিবার ছুটি, আমার কোন কাজ নেই, আপনাকে কাগান-নারান ভ্যালিটা ঘুরিয়ে দেখাবো। ভেবে দেখলাম, বারবার তো আসার সুযোগ হবে না, একেবারে দেখেই যাওয়া যায় কাগান-নারান ভ্যালী। সুউচ্চ পাহাড় আর খরস্রোতা নদীর মিলিত সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত এই উপত্যকা। না করার কোন মানে হয় না। সানন্দে রাযী হয়ে গেলাম। তারপর দোকান থেকে বের হয়ে এহসান ভাই, শাহেদ ভাই সহ ব্রীজের পাশ দিয়ে কুনহার নদীতে নেমে আসলাম। দু'জন সাথে থাকায় বেশ সাহস করে কয়েকটা পাথর ডিঙিয়ে বরফ ঠাণ্ডা পানিতে পা ডুবালাম। বড় বড় পাথরের ফাঁক গলিয়ে সবেগে স্রোত বের হয়ে আসছে। সেই স্রোতে পড়লে নির্ঘাৎ প্রাণ হারাতে হবে। প্রতি বছর এমন দু'চারটা দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। বিশেষতঃ পর্যটকরা বেখেয়ালে কিংবা অতি উৎসাহে নদীতে নামতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনেন। কয়েকটা ঘটনা শুনালেন এহসান ভাই। এমনকি অধিকাংশের মৃতদেহ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।[৫৭] পাহাড়ী এই নদীগুলো আমাদের চিরচেনা নদীর মত নয়। কিছু কিছু স্থান বাদে নদীর তলদেশ অগভীর, যদিও প্রস্থে অনেকটা চওড়া। বড় বড় পাথরে ভর্তি সর্বত্র। নৌকা চলাচলের কোন উপায় নেই। সারাবছর স্রোতের তোড় থাকে। তবে বর্ষাকালে মাত্রাটা অনেক বেড়ে যায়। তখন নদীর পরিবর্তে একে বিরাট এক ঝর্ণাধারা বললেও মনে হয় ভুল হয় না।

'কুনহার' নামটির উৎপত্তি নিয়ে রয়েছে নানা ইতিহাস। মাওলানা ছিদ্দীক বলছিলেন, এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ উপকথা হ'ল, একবার কোন রাজার কন্যা বা স্ত্রী নদীর পানিতে নামলে গলার হার পানিতে পড়ে যায়। সেই থেকে এর নাম কুনহার। মজার ব্যাপার যে, এই নদীর আরেকটি নাম হ'ল 'নয়ন সুখ'। খাঁটি বাংলা একটি বাক্য। অর্থেও কোন ভিন্নতা নেই। অথচ বলা হয়, এটি নাকি ফারসী ভাষার শব্দ! ধাঁধাই থেকে গেল বিষয়টা নিয়ে। শব্দটির উৎপত্তি ফারসী না হয়ে হিন্দকোই হওয়ার কথা। কারণ বাংলার সাথে হিন্দকো ভাষার যথেষ্ট মিল আছে। উদাহরণস্বরূপ বাংলায় 'কোথায় যাচ্ছ' বাক্যটি হিন্দকোতে 'কোথা যাছো' বাক্যে প্রকাশ করা হয়। অনুরূপভাবে 'নয়ন সুখ' নামটিও হিন্দকো ভাষার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। যেহেতু এখানকার প্রচলিত ভাষাও হিন্দকো।

সেখান থেকে হাসপাতালে ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করলাম। আছরের পর একাকী বের হ'লাম আবার। ভাবছিলাম পাহাড়ের উপরে মেট্টিকোট গ্রামটি থেকে ঘুরে আসব। কিন্তু বাযারে দাঁড়িয়ে থাকা চাঁদের গাড়ি চালক বলল, মেট্টিকোট যেতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে। আর মাগরিব পর উপর থেকে কোন গাড়ি আর নীচে নামবে না। সুতরাং ওদিকে আর না গিয়ে পায়ে হেঁটে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর কবরের দিকে অগ্রসর হ'লাম। পাহাড়ের গা বেয়ে পীচ ঢালা পথ উঠে গেছে। পা টিপে টিপে হাঁটছি। 'মূসা কা মুছাল্লা' পর্বতের বরফাবৃত চূড়া অপরাহ্নের সোনালী সূর্যালোকে তখন বিরাট এক স্বর্ণখণ্ডে পরিণত হয়েছে। দূরের কুনহার নদী আর পাহাড়ের গোড়ায় বালাকোট শহরটাও নযরে আসছে প্রায় পুরোটাই উপর থেকে। ঊর্ধ্বাকাশে ছন্নছাড়া মেঘের গায়ে বিচিত্র রঙের ছন্দ। এমন বিশুদ্ধ কাব্যময় দৃশ্যপটকে সামনে রেখে মহাকালের এই ক্ষুদ্রতম অংশটিকে মনে হয় স্রেফ আমার, একান্তই আমার। প্রাণভরে উপভোগ করি মহান আল্লাহ্‌র এই নয়নাভিরাম অপরূপ সৃষ্টিসুধা।

হাঁটতে হাঁটতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহঃ) যে পাথরের নিকটে শাহাদাত বরণ করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়, সেখানে এসে দাঁড়াই। অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি সেই পাথরের বিশাল ঢিবি, কালো হয়ে যাওয়া মাটি, গাছের শিকড়, আগাছা, সবকিছু। প্রকৃতির রস শুষে প্রায় দু'শো বছর পূর্বেকার সেই মুহূর্তটি কল্পনায় আনার চেষ্টা করি। তারপর পিছনের পথ দিয়ে উঠে আসি উঁচু ঢিবির উপর। উপর থেকে যুদ্ধের স্থানটি আরো স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সাতবানে ঝর্ণার পাথরভরা সেই বিরাট চওড়া বুকটা দেখি যেখানে বালাকোটের মুজাহিদরা অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। ঝর্ণার ওপাশে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) এবং অপরাপর মুজাহিদদের কবরগাহটি দেখা যায়। একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে থাকি একদৃষ্টে। ইতিহাসের এক চওড়া বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে মাথার ভিতর তখন ঘুরতে থাকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মিশেলে এক অদ্ভুত পরাবাস্তব কল্পনা।

---

৫৭. আমি বালাকোট ঘুরে আসার মাসখানেক পর খবরে পড়লাম, জামা'আতে ইসলামী করাচীর নায়েবে আমীর জনাব নাছরুল্লাহ সাজী তাঁর স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে এক শিক্ষাসফরে বালাকোটে এসে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। সেই একই ঘটনা। এক ছাত্র নদীতে নেমে পা হড়কে পড়ে গিয়ে স্রোতের তোড়ে ভেসে যায়, তারপর তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে তিনিও ভেসে যান। পরে অবশ্য তাদের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।

মাগরিবের আযান হ'লে ব্রীজটা পার হয়ে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর কবরের পার্শ্বের মসজিদটায় ছালাত আদায় করি। মসজিদটি তাঁর নামে নামকরণ করা হ'লেও ইমাম-মুছল্লী সবাই গতানুগতিক ধর্মের অনুসারী। যে আক্বীদা-আমল প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবন দিলেন শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ), তার কোন ছাপ নেই মুছল্লীদের মধ্যে। ভারাক্রান্ত মনে বেরিয়ে আসলাম মসজিদ থেকে। তারপর আবার হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসি এফআইএফ-এর ফিল্ড হাসপাতালে। এহসান ভাই এসে দুঃসংবাদটা দিলেন যে, ল্যাণ্ড স্লাইডিং অর্থাৎ পাহাড়ী ভূমিধ্বসের কারণে নারান-কাগানের রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে। তাই কালকে আর ওদিকে যাওয়া সম্ভব হবে না। আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে আবার বালাকোটে বেড়াতে আসেন, সে সময় সব ঘুরে দেখাবো ইনশাআল্লাহ।

৫

পরদিন সকালে নাশতার পর এহসান ভাই আসলেন মটর সাইকেল নিয়ে, সোহেল নাজাফ খান গ্রামটা দেখাবেন বলে। রওয়ানা হ'লাম তাঁর সাথে। মানসেহরাগামী রাস্তা ধরে কয়েক কিলোমিটার যাওয়ার পর এক জায়গায় থামলেন। এটা সোহেল নাজাফ খান থেকে কিছুটা আগের এক গ্রাম। তার এক বন্ধু থাকেন এই গ্রামে, তাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেন। গ্রামটির নাম শাহোতার। নদী পার হয়ে যেতে হয়। নৌকা চলাচলের কোন সুযোগ নেই, তাই রোপওয়ে তৈরী করা হয়েছে মানুষের যাতায়াতের জন্য। হস্তচালিত মেশিনে নিয়ন্ত্রিত সেই রোপওয়ের ক্যাবল কারে বসে নদী পার হই। নীচে তুমুল শব্দে বহমান কুনহার। তার উপর দিয়ে যেন পাখির মত উড়ে যাচ্ছি। অসাধারণ এক অনুভূতি। ওপারে নেমে সুবিস্তৃত গম ক্ষেতের মধ্য দিয়ে গ্রামের পথ ধরলাম। গ্রামে ঢোকার পর এহসান ভাইয়ের বন্ধু সোহেল ভাই বেরিয়ে এসে তার বাসায় নিয়ে গেলেন। সঊদী রিলিফের প্লাইউড দিয়ে তৈরী করা লাল বাড়ি। আশেপাশের অধিকাংশ বাড়ী একই ধরনের। অর্থাৎ ভূমিকম্পের আঘাত থেকে রক্ষা পায়নি এই গ্রামটিও। গ্রামের পিছনের পাহাড়টার চূড়াতেও বসেছে বরফের মেলা। ঘরের জানালা দিয়ে দেখি সেই মনোরম দৃশ্য।

চা-নাশতা সেরে বাসা থেকে বের হই। এহসান ভাই এখানে মূলতঃ নিয়ে এসেছিলেন গম ও অন্যান্য তরি-তরকারীর বিশাল ক্ষেতগুলো দেখাতে। দূর থেকে শুধু আমরা পাহাড়ই দেখি, পাহাড়ের নীচে যে এত বড় ফসলের মাঠ থাকে তা খুব কমই খেয়াল করা হয়। সবুজ-শ্যামল এই গ্রামটা সত্যিই অন্তর জয় করে নিল।

সোহেল নাজাফ খান গ্রামে আর যাওয়া হ'ল না। শহরে ফিরে আসলাম। বালাকোটের চাপলি কাবাব বেশ বিখ্যাত। অফিসের ভাইদের জন্য কিনলাম সবাই একসাথে খাওয়ার জন্য। নারানের আখরোটও কেনা হ'ল। তারপর অফিসে ফিরে এসে দুপুরের খাবার খেয়ে ইসলামাবাদ ফেরার প্রস্তুতি নিলাম। বিদায়ের সময় সবার সাথে আরেক দফা মোলাকাত হ'ল। রোগী ফেলে ডাক্তার, ল্যাবরেটরিয়ান চলে আসলেন। দু'দিনে তাদের সাথে এমন আন্তরিকতা গড়ে উঠেছে যে ছেড়ে আসতে কষ্ট হচ্ছে। সময় পেলেই বালাকোট ঘুরে যাওয়ার জন্য তাদের বারাংবার আন্তরিক অনুরোধে মনটা প্রশান্ত হয়ে গেল। এমন ভূস্বর্গে, জিহাদ আন্দোলনের মহান স্মৃতিমাখা ভূখণ্ডে তো বারবারই আসতে চাই। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওয়ানা হ'লাম মানসেহরার উদ্দেশ্যে। কাশ্মীরের মুযাফফরাবাদ হয়ে ইসলামাবাদ ফেরার আরেকটি রুট আছে বালাকোট থেকে। কিন্তু পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে এই শংকায় ঐ রুটে যেতে বারণ করলেন সাজ্জাদ ভাই। মানসেহরা পৌঁছে সেখান থেকে অপর এক মাইক্রোতে ইসলামাবাদ ফিরে আসলাম। সবমিলিয়ে সফরটা আমার আজীবনের জন্য স্মরণযোগ্য তালিকায় উঠানো হয়ে গেল। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

(সমাপ্ত)

মাদরাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিয়া
(ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয়)
আকাশতারা, সাবগ্রাম, বগুড়া সদর, বগুড়া।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
প্লে থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু :
১০ ডিসেম্বর ২০১৪।
ভর্তি পরীক্ষা :
০৫ জানুয়ারী ২০১৫ সকাল ১০টা।

আমাদের সাফল্য :
২০১০ সালে বৃত্তি সহ শতভাগ ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ
২০১১ সালে এ প্লাস সহ শতভাগ পাশ
২০১২ সালে শতভাগ এ প্লাস
২০১৩ সালে এ প্লাস সহ শতভাগ এ গ্রেড

বিস্তারিত জানতে :
০১৭১০-১৪৬৯৯৯, ০১৭১৬-৪৭৬৪৩২
০১৭৪৯-০৬০৩৭৩, ০১৭৩২-৪২০২৬২

মাদরাসার বৈশিষ্ট্য সমূহ

- নির্ধারিত ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- প্রত্যেক বছর একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন।
- একাডেমিক ক্যালেন্ডারের সাথে সমন্বয় করে পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়।
- যুগোপযোগী উন্নতমানের সিলেবাস।
- অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী ও নিবেদিত শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক তথ্য ও দেশী-বিদেশী বই সমৃদ্ধ লাইব্রেরী।
- ক্লাসের পর কোচিং এর বিকল্প হিসাবে 'সুপারভাইজরী স্টাডি প্রোগ্রাম' এর সুবিধা।
- শিক্ষার্থীদের সুপ্ত মেধা বিকাশের জন্য বিভিন্ন কো-কারিকুলাম কার্যক্রম গ্রহণ।
- আরবী ও ইংরেজীতে কথোপকথনে অভ্যস্ত করণ।
- স্বাস্থ্যসম্মত সুন্দর ও উন্নতমানের আবাসিক ব্যবস্থা।

হকের দিশা পেলাম যেভাবে

তুমি বেলাইনে চলে গেছ

আমি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। পিতা- মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ। গ্রাম-পাড় নান্দুয়ালী। ডাকঘর, থানা ও যেলা- মাগুরা। দেশের প্রচলিত শিক্ষাতে এম.এ ডিগ্রি সম্পন্ন করে নিজ উপযেলায় একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছি। সেই সাথে বিভিন্ন হাইস্কুল ও কলেজের ছাত্ররা আমার কাছে ইংরেজী প্রাইভেট পড়ে। 'নিসর্গ' নামে আমাদের একটি যুবসংগঠন আছে, আমি তার সম্পাদক। এখান থেকে একটি বার্ষিক প্রকাশনা আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। যাই হোক আমাদের গ্রামের মানুষ ফুরফুরা, চরমোনাই প্রভৃতি পীরের মুরীদ। আমি ব্যক্তিগতভাবে মুরীদ না হ'লেও মনে মনে তাদের প্রতি একমত পোষণ করতাম। গ্রামের ইছালে ছাওয়াব সহ বিভিন্ন মাহফিলে যেতাম, শিরক করতাম, মাযহাব ফরয বলে জানতাম ও মানতাম। ছোটবেলায় স্থানীয় মসজিদের ইমাম ছাহেবের নিকটে যখন কুরআন পড়া শিখি তখন তিনি আমাকে কিছু দ্বীনি শিক্ষা দেন এবং কয়েকটি সূরা মুখস্থ করান। ছোটবেলা থেকেই আমি ছিলাম অত্যন্ত পড়ুয়া। উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে ইসলামিক স্টাডিজ পাঠ্য ছিল বলে আল-কুরআন ও হাদীছ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আছে। একদিন আমার এক সহকর্মী বড় ভাই চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মুহাম্মাদ জুলহাসুদ্দীন ছাহেব আমার আক্বীদা সম্পর্কে জানতে চাইলে আমি যে উত্তর দিলাম তাতে তিনি কিছুটা হাসলেন। তিনি কুরআনের কিছু আয়াত বলে আমার ভুলটা ধরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আমরা যে জানি নবী করীম (ছাঃ) নূরের তৈরী, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান ইত্যাদি অনেক কিছু। তিনি বললেন, এসব ভুল। আমি বললাম, প্রমাণ চাই। তখন তিনি আমাকে আক্বীদার উপরে কুরআনের কয়েকটি আয়াত শুনালেন।

আয়াতগুলো অর্থসহ পড়লাম ও বুঝলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার চিন্তার জগতে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। হায়! জীবনের এতগুলো বছর চলে গেল জানা-অজানা শিরকে নিমজ্জিত থেকে? নিজেকে মনে হচ্ছিল যেন, আমিই সবচেয়ে বড় মুশরিক। এরই মধ্যে মে মাসে গ্রীষ্মের ছুটি চলে আসল। জুলহাস ভাই ও আরও ২ জন (১ জন শিক্ষক ও ১ জন বন্ধু)-কে নিয়ে গেলাম রাজশাহীর নওদাপাড়াস্থ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর কেন্দ্রে। সেখানে ঘুরে দেখলাম 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, আত-তাহরীক অফিস, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয়কেন্দ্র। ওখানে গিয়ে ছোট্ট একটা বৈঠক হ'ল শায়খ আমানুল্লাহ মাদানী ছাহেবের সাথে। তিনি বাংলাদেশের একজন অন্যতম বাগ্মী। জুলহাস ভাইয়ের দাওয়াতী কাজের কথা শুনে তিনি বললেন, আপনি নিজে বেশী বেশী পড়ুন। নিজে না জেনে দাওয়াতী কাজ করতে গেলে তো প্রতিবন্ধকতায় পড়বেন। একথা শুনে আমি যা বুঝার বুঝে ফেললাম। তিনি তার জীবনে ঘটে যাওয়া বাস্তব ১টি ঘটনা বললেন। শুনে আমি মুগ্ধ, বিস্মিত! তাঁর কথা শুনে আমার চিন্তার জগৎটাই এলোমেলো হয়ে গেল।

তাঁর সাথে কথা শেষ করে চললাম হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্রে। সেখানে সাক্ষাৎ হ'ল মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার সহ-সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ছাহেবের সাথে। তাঁর কথা শুনে আমি আরও চমৎকৃত হ'লাম। তিনি আমাদের বললেন, পাড় নান্দুয়ালী, মাগুরার সন্তান হাসানুল ইসলাম (হাসান)-এর কথা। এবার আমার ভিরমী খাওয়ার দশা। বলে কী! তিনি হাসানকে চেনেন কীভাবে? হাসান তো থাকে মক্কায়। হাসান আমার বেশ জুনিয়র। হাসানের পিতা হাজী আব্দুল মালেক ছাহেবকে আজ থেকে ৩৫ বৎসর পূর্বে দ্বীন সম্পর্কে ছহীহ হাদীছের কথা বলাতে সমাজের তথাকথিত হানাফী ও ফুরফুরার মুরীদদের কাছ থেকে অনেক লাঞ্ছনা পেতে হয়েছিল। এমনকি একঘরে পর্যন্ত হ'তে হয়েছিল। যাই হোক লাইব্রেরী থেকে অনেক টাকার বই কিনলাম। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'ও কিনলাম। আমি তাঁর গ্রেফতারের দৃশ্য টিভিতে দেখেছিলাম। সেই থেকে তাঁর প্রতি এক অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভক্তি তৈরী হয়। কিনলাম মুযাফফর বিন মুহসিনের 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত' বইটি। সঙ্গে আরও কিছু বই। কিন্তু উল্লিখিত বই দু'টো পড়ে আমার জীবনটাই বদলে গেল। ভাবলাম, হায়রে আমার যিন্দেগীর সকল আমলই তো বিদ'আতের জন্য বরবাদ হয়ে গেছে। বাড়ীতে এসে শুরু করলাম সব ধরনের ধর্মীয় বই পড়া। এসব বই তো পড়লামই, আরও পড়লাম মাওলানা আব্দুল্লাহ্‌র লেখা আক্বীদা সংক্রান্ত পুস্তিকা। পড়তে থাকলাম নিয়মিত মাসিক 'আত-তাহরীক'। এরপর ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের সব খণ্ড কিনলাম। জুলহাস ভাই দিলেন সুনানে আবুদাঊদ। তিনিও তাফসীর ইবনে কাছীর ১১ খণ্ডের সবগুলো কিনলেন। দেখতে লাগলাম, পিস টিভি বাংলার নিয়মিত সব অনুষ্ঠান। সেখানে বিশ্বের সব বড় বড় আলেম নিয়মিত দরস দিয়ে থাকেন। জুলহাস ভাই মোবাইল সেটে দিলেন উক্ত বক্তাদের বক্তব্য। মক্কায় অবস্থানরত হাসানের সাথে যোগাযোগ হ'ল। সে দিল আরও কিছু বক্তব্য। এই সকল বক্তব্য শুনতে থাকলাম প্রাণ ভরে। মনটা প্রশান্তিতে ভরে গেল। পড়াশুনা শুরু করলাম হাদীছ যাচাইয়ের জন্য রিজাল শাস্ত্রের উপরে। সেই সাথে শুরু হ'ল ছহীহ হাদীছের উপর আমল। প্রথমে পরিবার ঠিক করলাম। স্ত্রীকে নিয়ে হাসানদের আহলেহাদীছ মসজিদে যাওয়া শুরু করলাম। বিদ'আতী মসজিদ ছেড়ে নিয়মিত ছালাত আদায় করি আহলেহাদীছ মসজিদে। শুরু হ'ল গ্রামে কানাঘুষা ও সমালোচনা। তবুও মনে শান্তি পাই সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছি বলে। একদিন মাগুরার কয়েক জন ভাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে তারাবীহ ৮ রাক'আত না ২০ রাক'আত এ সম্পর্কে বাহাছ করতে গেল ধরহরা পশ্চিমপাড়া মাদরাসার জামে মসজিদে। তারা পূর্ব ঘোষণা দিয়ে আমাদের যেতে বলেছিল। কিন্তু তাদের আশঙ্কা ছিল যে জনগণ সত্যটা জেনে যাবে। এজন্য তারা আমাদের কথাই বলতে দিল না। একতরফাভাবে তারাই কথা বলল।

এরপর একদিন বৈঠক হ'ল মাগুরা টার্মিনাল মসজিদের ছানী ইমাম হাফেয মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সাথে। সে আমার আপন চাচাতো শ্যালক। আমি তাকে রাফউ ইয়াদায়েনের ৫১টি হাদীছ, বুকে হাত বাঁধা, জোরে আমীন বলার উপর একের পর এক হাদীছ দেখাতে লাগলাম। আর সে সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করে বলল, আমি তো কুরআনের হাফেয, তাই হাদীছ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না। আর আপনার আক্বীদা সংক্রান্ত কথাও শুনব না। কারণ আমি ফুরফুরার মুরীদ, তাই পীরের কথা ব্যতীত কারো কোন কথা শুনতে রাযী নই। আমি বললাম,

তাহ'লে তোমার সাথে কথাই চলে না। সে বলল, আগামীকাল একজন বড় আলেম নিয়ে আসব, আপনি তৈরী থাকবেন। আমি বললাম, ইনশাআল্লাহ থাকব। পরের দিন সে সঙ্গে নিয়ে আসল হাফেয মাওলানা আরীফুল ইসলামকে। যিনি আমাদের মহল্লার সবচেয়ে বড় মসজিদে প্রতি বৎসর তারাবীহ ছালাত পড়ান। বসলাম তার সাথে। প্রথমেই তিনি আমাকে হানাফী মাযহাবের কথা বললেন। আমি উদ্ধৃতি দিলাম হানাফী মাযহাবের ব্যরিস্টার বলে খ্যাত ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু ইউসুফ এবং হানাফী মাযহাবের সবচেয়ে বড় আলেম আনোয়ার শাহ কাশ্মিরীর। আরও দেখালাম, প্রখ্যাত দেওবন্দী আলেম আশরাফ আলী থানবীর উক্তি। দেখালাম, রাফউল ইয়াদায়েনের ৫১টি ছহীহ হাদীছ, জোরে আমীন বলা ও বুকে হাত বাঁধার ছহীহ হাদীছ। এগুলোতে না পেরে অবশেষে তারাবীহ ২০ রাক'আতের কথা উঠল। আমি বললাম, আপনি দেখাচ্ছেন মাওকূফ হাদীছ আর আমি দেখাচ্ছি মারফূ হাদীছ। অতএব আপনারটার চেয়ে আমারটা শক্তিশালী। এক পর্যায়ে তিনি রেগে গেলেন। আমার শ্যালক বলল, আপনি কী বড় আলেম হয়ে গেছেন? ছহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারেন? ইতিমধ্যে রাজশাহী থেকে এসে রামাযানে আমি প্রায় ১ পারা (৩০তম পারা) হিফয করে ফেলেছি। সে তা জানতো না। কিন্তু তেলাওয়াতে আমার দুর্বলতা আছে। তাই তার এই কথায় আমি কিছুটা অসহায় হয়ে পড়লাম।

আমি বললাম, আমার জন্য দো'আ কর, আমি যেন আল্লাহ্র রহমতে আগামী রামাযানের আগেই ছহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিখতে পারি। তারা এই একটি জায়গায় আমাকে ঘায়েল করে ফেলল। বৈঠক শেষ হ'ল। জুলহাস ভাইকে জানালাম। তিনি বললেন, তুমি তো মাত্র ৩ মাসের আহলেহাদীছ, তাতেই তাদের এই অবস্থা? না জানি পরে কী হবে? আল্লাহ তোমার সহায় হৌন। শুরু করলাম হানাফী মুফতি যুবায়ের ছাহেবের কাছে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ। এই মাদরাসাটা হাসানদের আহলেহাদীছ মসজিদের কাছেই। তবে তিনি ছহীহ আক্বীদার আলেম। আমল হয়ত আমাদের মত করেন না। কিন্তু আমাদের প্রতি যথেষ্ট সহনশীল এবং দুর্বল। তিনি পড়াতে লাগলেন সপ্তাহে দুই দিন। মোটামুটি এগিয়ে চলছি। এমন সময় খবর পেলাম আলোকদিয়ার বর্তমান পীর ছাহেব জনাব ফরহাদ হোসেন ছাহেব ছহীহ হাদীছের উপর আমল শুরু করেছেন। আমরা তো খুবই আনন্দিত। কারণ দল ভারী হচ্ছে। জুলহাস ভাই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আমাকে বললেন, এবার আমাদের সংগঠন করতে হবে। আমাদের মুরব্বী মশিউর রহমান মোল্লা ছাহেবকে বললাম, আহলেহাদীছ সংগঠন করার কথা। তিনি বললেন, হাসান আসুক, তারপর সিদ্ধান্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

এবার আসল বড় আঘাত। আব্দুল বাসিত নামে আমাদের গ্রামের একজন বড় ভাই একদিন দলবলসহ আমার কাছে এসে বলল, তোমরা তো লা-মাযহাবী, কোন মাযহাব মান না। গায়রে মুকাল্লিদ। তোমরা তাকলীও কর না। ইমাম আবু হানীফার প্রতিও আনুগত্য নেই। আমি বললাম, দেখুন, সকল মুসলিমের সবচেয়ে বড় তাকলীদ হওয়া উচিত বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি। তিনিই মানব জাতির সবচেয়ে বড় পথ প্রদর্শক। এতদিন ফুরফুরা শরীফের মাধ্যমে যা জেনেছি তাতে আক্বীদাগত অনেক ত্রুটি রয়েছে। তাছাড়া এর আগে আপনি বিতর ছালাতের কাযা সম্পর্কে যে মাসআলা দিয়েছিলেন তা ছহীহ হাদীছের সম্পূর্ণ উল্টা। তিনি আমাকে অপমান সূচক অনেক কথা বললেন। আমি বললাম, নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ রয়েছে, এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তাকে অত্যাচার করবে না। তিনি আরো বলেছেন, 'মুমিন সেই ব্যক্তি যার হাত ও যবান থেকে অন্য মুমিন নিরাপদে থাকে'। আর আপনি আমাকে হুকমি দিচ্ছেন। তখন তো তিনি রেগে আগুন। আমি বললাম, আমার মোবাইল থেকে মদীনার বড় বড় আলেমদের বক্তব্য নিয়ে গিয়ে শুনুন। দেশীয় আলেমদের বক্তব্য এগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখুন, বুঝতে পারবেন। তিনি বললেন, বাপদাদার আমল থেকে যা চলে আসছে তা কী ভুল? আমি বললাম, ভুল না ঠিক তা উভয় বক্তব্য শুনে আপনিই বিচার করুন। আল্লাহ তো পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম আয়াতেই নাযিল করেছেন, 'ইকরা' (পড়)। কুরআন হচ্ছে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। আমি তো উভয় দিকই পড়ছি। তাহ'লে আপনি পড়েন না কেন? অন্ধবিশ্বাসের দিন শেষ। তিনি বললেন, তোমার এসব কথা শোনাটাও পাপ। তুমি এতদিন মাযহাব ও ফুরফুরা শরীফের সঠিক পথে ছিলে; এখন বেলাইনে চলে গেছ। আমি বললাম, ছহীহ হাদীছের উপরে আমল করা যদি বেলাইনে যাওয়া হয়, তবে আমি সেই বেলাইনেই যেতে চাই। এবার তিনি বললেন, মাযহাব ও ফুরফুরা বিরোধীদের আমাদের গোরস্থানে জায়গা হয় না, তাকি তুমি জান? আমি বললাম, আমার তাকদীরে আল্লাহ আগেই লিখে রেখেছেন কোথায় আমার দাফন হবে। আমি আরো বললাম, ইমাম আবু হানীফার সবচেয়ে বড় অনুসারী আমি। তবে তাঁর যে কথাগুলো ছহীহ হাদীছের সাথে মেলে আমি সেগুলো মানি।

আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ সহ বড় বড় হানাফী আলেমের বই এর উদাহরণ দিলাম। এবার তিনি আমার সাথে না পেরে আমাকে নব্য ফেৎনা সৃষ্টিকারী যালেম বলতে বলতে দলবল সহ চলে গেলেন। আমি জানতাম, আল্লাহ পাকের রহমতে আমার আব্বার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার কারণে আমার সাথে সরাসরি মারামারি করা হয়তো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু অনেক চক্রান্ত করতে পারে, তাই সাবধান থাকলাম। আর কোন কিছুকে পরোয়া না করে সম্পূর্ণ আল্লাহ্র উপর ভরসা করে দাওয়াতী কাজ করব বলে মনস্থ করলাম। এজন্য দাওয়াতী কৌশল শেখার চেষ্টা করছি। এখন আমি নিজের মত করে যেভাবে পারি আমার ছাত্রদের মাঝে এবং তাদের অভিভাবকদের মাঝে (যারা আমাকে খুব মান্য করে) আমার কায়দায় দাওয়াত দিচ্ছি। কিন্তু সঠিকভাবে হচ্ছে কি-না জানি না। সকল প্রকার সামাজিক ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই ভয় পাই না। আল্লাহ ছাড়া আমার এ দাওয়াতী কাজের গতি দুনিয়ার আর কেউ রুখতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য যে, সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর (জেনারেল শিক্ষিত) বেশ কয়েকজন ভাই আক্বীদাগত সংশোধন হয়েছেন। এখন শুধু আমলগত পরিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহ তাদের হেদায়াত নছীব করুন। আমীন! সবাই আমার জন্য দো'আ করবেন।

-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
পাড়নান্দুয়ালী, মাগুরা।

আবু দাহদাহ (রাঃ)-এর দানশীলতা

ভূমিকা :

মদীনা ছিল খেজুর বৃক্ষ সমৃদ্ধ অঞ্চল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হিজরতের পর একে 'মদীনাতুন্নবী' নামে আখ্যায়িত করা হয়। মদীনার চতুষ্পার্শ্বে খেজুর বাগান ও গাছের এত আধিক্য ছিল যে, বৃষ্টির কারণে কোন খেজুর নিচে পড়লে তা নির্ণয় করা কঠিন হত যে, এটা কোন গাছের খেজুর। এরূপ বাগানকে কেন্দ্র করে ছাহাবীগণের মধ্যেও কোন কোন সময় বিতর্কের সৃষ্টি হ'ত। সমাধানের জন্য তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে যেতেন এবং সঠিক সমাধান পেতেন। এক্ষেত্রে ছাহাবীগণ তাঁকে সহযোগিতা করতেন। আবু দাহদাহ (রাঃ) তার ছয়শ' খেজুর গাছের বাগান দান কারার মাধ্যমে এরূপ এক বিবাদের সমাধান করেছিলেন।

আবু দাহদাহ (রাঃ)-এর পরিচয় : তাঁর আসল নাম ছাবেত ইবনু দাহদাহ। তবে তিনি আবু দাহদাহ নামে সমধিক পরিচিত। তিনি একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ছাহাবী ছিলেন। মদীনায় মুছ'আব ইবনু ওমায়ের (রাঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর দানশীলতার কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। ওয়াক্বেদী আব্দুল্লাহ ইবনু আমের থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন যখন মুসলমানেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদে দিশেহারা হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল, তখন আবু দাহদাহ (রাঃ) বলেছিলেন, বলে ওঠেন, يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَار،إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ قَدْ قُتِلَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ! فَقَاتِلُوا عَنْ دِينِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ مُظْهِرُكُمْ وَنَاصِرُكُمْ 'হে আনছারগণ! যদি মুহাম্মাদ নিহত হয়ে থাকেন, তবে আল্লাহ জীবিত আছেন, তিনি মরেন না। তোমরা তোমাদের দ্বীনের উপরে যুদ্ধ করো। কেননা আল্লাহ তোমাদের বিজয় দানকারী ও সাহায্যকারী'। ... তার একথা শুনে একদল আনছার উঠে দাঁড়াল এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে ছাবিত সরাসরি খালিদ ইবনে ওয়ালীদের বাহিনীর উপরে হামলা চালালেন, পরে খালিদের বর্শার আঘাতে তিনি শহীদ হন। সঙ্গীরাও শহীদ হয়ে যান *(ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ১/৬১৬; ওয়াক্বেদী, মাগাযী ১/২৮১; আর-রাহীকুল মাখতূম ১/২৪১)*

দানশীলতার অনুপম দৃষ্টান্ত : মদীনার বাগান সমূহের মধ্যে এক ইয়াতীম বাচ্চার একটি বাগান ছিল। তার বাগানের সাথে অন্য এক লোকেরও একটি বাগান ছিল। যার নাম ছিল আবু লুবাবা। ইয়াতীম চিন্তা করল, আমি জমির সীমানা বরাবর প্রাচীর নির্মাণ করে বাগানটি আদালা করে নেব। যাতে প্রত্যেকের অংশ পৃথক হয়ে যায়। যখন প্রাচীর দিতে শুরু করল তখন দেখা গেল তার প্রতিবেশীর একটি খেজুর গাছ সীমানার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। যার কারণে প্রাচীরটি সোজা হচ্ছে না। তাই সে তার প্রতিবেশীর নিকট গিয়ে বলল, আপনার বাগানে অনেক খেজুর গাছ। আমি একটি প্রাচীর দিতে চাচ্ছি, কিন্তু আপনার একটি খেজুর গাছের কারণে প্রাচীরটি সোজা হচ্ছে না। ঐ গাছটি আমাকে দিয়ে দিন তাহ'লে আমার দেওয়ালটি সোজা হয়ে যাবে। এতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। লোকটি বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি খেজুর গাছটি দান করব না। ইয়াতীম ছেলেটি বলল, ভাই আপনার তো কোন ক্ষতি হবে না। হয় আপনি গাছটি দান করুন আর না হয় আমার কাছ থেকে এর মূল্য নিয়ে নিন। সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি এর কোনটাই করব না। ইয়াতীম ছেলেটি তাকে বুঝানোর চেষ্টা করল। প্রতিবেশীর অধিকারের কথা বলল। কিন্তু সে ছিল দুনিয়াপ্রেমিক। তাই না সে ইয়াতীমের অসহায়ত্বের প্রতি লক্ষ্য করল, আর না প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি। ইয়াতীম বলল, তাহ'লে কি আমি প্রাচীর দিব না এবং তা সোজা করব না? প্রতিবেশী লোকটি বলল, এটা তোমার ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই। ইয়াতীম যখন তার কথায় নিরাশ হ'ল তখন সে চিন্তা করল যে, এমন একজন ব্যক্তি আছেন যদি তিনি সুপারিশ করেন, তাহ'লে হয়ত আমার কাজ হ'তে পারে। একথা মনে করে সে মসজিদে নববীর দিকে রওয়ানা হ'ল।

ঐ ইয়াতীম মসজিদে নববীতে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার বাগান অমুক ব্যক্তির বাগানের সাথে মিশে আছে। আমি এর মাঝে প্রাচীর দিতে চাচ্ছি। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত প্রাচীর সোজা হচ্ছে না যতক্ষণ না আমার প্রতিবেশীর একটি খেজুর গাছ আমার দখলে আসবে। আমি তার মালিককে বলেছি যে, এটি আমার নিকট বিক্রি করে দাও। আমি তাকে যথেষ্ট বুঝানোরও চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে তা অস্বীকার করছে। হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার জন্য তার নিকট একটু সুপারিশ করুন যাতে সে আমাকে ঐ খেজুর গাছটি দিয়ে দেয়। তিনি বললেন, যাও! তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

ঐ ইয়াতীম তার নিকট গিয়ে বলল, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আপনাকে ডেকেছেন। সে মসজিদে নববীতে আসল। নবী করীম (ছাঃ) তার দিকে তাকিয়ে বললেন, সে বেড়া দিয়ে তোমার বাগান থেকে তার বাগান পৃথক করতে চায়। তোমার একটি খেজুর গাছের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। তুমি তোমার ভাইকে ঐ খেজুর গাছটি দিতে নাকি অস্বীকার করেছ?

লোকটি বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, গাছটি তোমার ভাইকে দিয়ে দাও।

সে বলল, আমি দিব না। তিনি তাকে কয়েকবার বলার পরেও যখন রাযী হ'ল না তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার ভাইকে ঐ খেজুর গাছটি দিয়ে দাও। আমি তোমার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছের যিম্মাদার হব। ঐ লোকটি এ কথা শুনেও বলল, না আমি তা দিব না। তিনি তখন চুপ হয়ে গেলেন। এর চেয়ে বেশী তিনি তাকে আর কী বলতে পারেন!

ছাহাবীগণ নিশ্চুপ থেকে কথাবার্তা শুনছিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে আবু দাহদাহ (রাঃ)ও ছিলেন। মদীনায় তার

খুব সুন্দর একটি বাগান ছিল। সেখানে ৬০০ খেজুর গাছ ছিল। সুস্বাদু খেজুরের কারণে বাগানটি খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এর খেজুর ছিল খুব উন্নতমানের এবং বাজারে তার যথেষ্ট চাহিদাও ছিল। মদীনার বড় বড় ব্যবসায়ী এ কামনা করত যদি এ বাগানটি আমার হ'ত। আবু দাহদাহ (রাঃ) ঐ বাগানের মধ্যে খুব সুন্দর করে স্বীয় ঘর নির্মাণ করেছিলেন। স্বপরিবারে তিনি সেখানে বসবাস করতেন। মিষ্টি পানির কূপ এ বাগানের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করেছিল। আবু দাহদাহ (রাঃ) যখন রাসূল (ছাঃ)-এর কথা শুনছিলেন তখন মনে মনে ভাবছিলেন যে, এ দুনিয়া কি? আজ নয় তো কাল মৃত্যুবরণ করতেই হবে। এরপর শুরু হবে চিরস্থায়ী জীবন। যা স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে, না দুঃখে ভরপুর হবে তা কে জানে? যদি জান্নাতে একটি খেজুর গাছ পাওয়া যায়, তাহ'লে আর কি চাই? সামনে এসে আবু দাহদাহ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যে কথা আপনি বললেন, এটা কি শুধু তার জন্যই খাছ? আমি যদি ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে ঐ খেজুর গাছটি ক্রয় করে এ ইয়াতীমকে দিয়ে দেই তাহ'লে আমিও কি জান্নাতে খেজুর গাছের মালিক হব?

রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তোমার জন্যও জান্নাতে খেজুর গাছ থাকবে। আবু দাহদাহ (রাঃ) ভাবতে লাগলেন, এমন কি সম্পদ আছে যা আমি ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে খেজুর গাছটি ক্রয় করব। তিনি ভেবে দেখলেন, মদীনায় তার একটি বাগান আছে। যেখানে ছয়শ' খেজুর গাছ, পানির কূপ ও একটি বাড়ি আছে। এগুলোর বিনিময়ে ঐ গাছটি কিনে ইয়াতীমকে দিয়ে দিব। তিনি ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন, শোন! তুমি আমার বাগান সম্পর্কে অবগত আছ, যেখানে ৬০০ খেজুর গাছ আছে, সাথে ঘর ও কুয়াও আছে? সে বলল, মদীনাতে এমন কে আছে যে আপনার বাগান সম্পর্কে জানে না? তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি আমার ঐ সম্পূর্ণ বাগান গ্রহণ করে তোমার একটি খেজুর গাছ আমাকে দিয়ে দাও।

ঐ ব্যক্তি তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে আবু দাহদাহ (রাঃ)-এর দিকে ফিরে তাকাল। অতঃপর লোকজনের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা লক্ষ্য কর, আবু দাহদাহ কি বলছে? লোকজন যখন তার কথার ব্যাপারে সাক্ষী হ'ল, তখন সে বলল, হ্যাঁ আমি তোমার খেজুর গাছের বাগান গ্রহণ করলাম এবং ঐ খেজুর গাছটি তোমাকে দিয়ে দিলাম। যখন তিনি ঐ খেজুর গাছের মালিক হয়ে গেলেন তখন ঐ ইয়াতীমকে বললেন, এখন থেকে ঐ খেজুর গাছটি তোমার। আমি তা তোমাকে উপহার হিসাবে দিলাম। এখন তোমার দেয়াল সোজা করতে আর কোন বাঁধা নেই। এরপর আবু দাহদাহ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এখন আমি কি জান্নাতে খেজুর গাছের মালিক হ'লাম? তিনি বলেন, كَمْ مِنْ عِذْقٍ رَدَاحٍ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ 'আবু দাহদাহর জন্য জান্নাতে এখন কত বিশাল বিশাল খেজুরের বাগান অপেক্ষা করছে'!

বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেন, এ শব্দটি তিনি এক, দুই বা তিনবার বলেননি; বরং খুশী হয়ে বারংবার বলেছেন।

শেষে আবু দাহদাহ (রাঃ) সেখান থেকে বের হ'লেন। জান্নাতে বাগানের সুসংবাদ পেয়ে নিজের বর্তমান বাগানের পথে রওয়ানা হ'লেন। মনে মনে বললেন, নিজের ব্যবহারিক কিছু কাপড় এবং কিছু যরূরী জিনিসপত্র তো ওখান থেকে নিতে হবে। তিনি বাগানের দরজায় এসে ভিতরে বাচ্চাদের কণ্ঠ শুনতে পেলেন। স্ত্রী তখন ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল আর বাচ্চারা খেলাধূলা করছিল। ভিতরে গিয়ে তিনি স্ত্রীকে সংবাদ দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন, হে উম্মে দাহদাহ!

উম্মে দাহদাহ অত্যন্ত অবাক হ'লেন যে, আজকে আবু দাহদাহ বাগানের বাইরে দরজায় কেন দাঁড়িয়ে আছেন? ভিতরে আসছেন না কেন? আবারও আওয়াজ আসল! উম্মে দাহদাহ! উত্তর আসল, আমি উপস্থিত হে আবু দাহদাহ! বাচ্চাদেরকে নিয়ে এ বাগান থেকে বের হয়ে আস। উম্মে দাহদাহ (রাঃ) বললেন, আমি বাগান হ'তে বের হয়ে আসব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি এ বাগান বিক্রি করে দিয়েছি। উম্মে দাহদাহ (রাঃ) বললেন, আপনি কার নিকট এটা বিক্রি করেছেন? কে কত দাম দিয়ে এটা ক্রয় করেছে? আবু দাহদাহ (রাঃ) বললেন, আমি জান্নাতে একটি খেজুর বাগানের বিনিময়ে তা বিক্রি করে দিয়েছি। উম্মে দাহদাহ (রাঃ) বললেন, আল্লাহু আকবার। হে আবু দাহদাহ (রাঃ)! আপনি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা করেছেন। জান্নাতের একটি বৃক্ষ, যার নিচে অশ্বারোহী একশত বছর পর্যন্ত চলার পরেও তার ছায়া শেষ হবে না *(বুখারী হা/৩২৫১)*। কী সৌভাগ্য আমাদের যে, আমরা জান্নাতে এমন একটি গাছ পাব। *(মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৫৭৯১-৯৩; হাকেম হা/২১৯৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৬৪; মু'জামুল কাবীর হা/৭৬৩; শু'আবুল ঈমান হা/৩৪৫১)*।

উপসংহার :

আবু দাহদাহ এবং উম্মে দাহদাহ (রাঃ)-এর এ দান কোন সাধারণ দান ছিল না। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর আশা পূরণের জন্য ও একজন ইয়াতীমকে সহায়তা করার জন্য নিজের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু তারা আল্লাহ্র রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছিলেন। স্বীয় বাসস্থান, মূল্যবান বাগান, কূপ ছেড়ে দিয়ে মানব জাতির জন্য দানের এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। এটাই হল সত্যিকারের নবীপ্রেম। আবু দাহদাহ ও তাঁর পরিবারের প্রতি আল্লাহ অবিরত ধারায় রহমত বর্ষণ করুন! এবং আমাদেরকে অনুরূপ দানশীল হওয়ার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

** আব্দুর রহীম*
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

Contents

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

অপরাধী স্বীয় অপরাধের প্রতিফল পাবে

এক দেশে ছিল এক বাদশাহ। তার একজন খুব বিশ্বস্ত খাদেম ছিল। সে বাদশাহ্র নিকট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিল। যখনই সে বাদশাহর কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হ'ত তখনই এ প্রবাদটি বলত, 'অনুগ্রহকারীর প্রতি তার অনুগ্রহের জন্য উত্তম আচরণ কর। কেননা খারাপ আচরণকারীর অসৎ আচরণই তার ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট'।

রাজসভার সদস্যদের একজন তার সাথে অত্যন্ত শত্রুতা পোষণ করত। সে বাদশাহর সাথে তার এরূপ সখ্যতা কোনক্রমেই মেনে নিতে পারছিল না। তার একান্ত ইচ্ছা ছিল, যে কোন উপায়ে তার ব্যাপারে বাদশাহকে খেপিয়ে তোলা। এ লক্ষ্যে কয়েকবার চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হয়। শেষে লোকটি ফন্দি আঁটল এবং সুযোগ বুঝে বাদশাহকে বলল, এ ব্যক্তি আপনার খুবই বিশ্বস্ত সে আপনার জুতা বহন করে। কিন্তু আসলে সে আপনার দুশমন। সে আপনার আনুগত্য করে না বরং বলে, আপনি কথা বললে আপনার মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়।

বাদশাহ বললেন, তোমার এ দাবীর প্রমাণ কি?

হিংসুক বলল, সন্ধ্যায় আপনি তাকে ডেকে আপনার দরবারে আসতে বলবেন। দেখবেন সে তার মুখে হাত দিয়ে রেখেছে। যাতে আপনার মুখের দুর্গন্ধ সে না পায়।

বাদশাহ বললেন, ঠিক আছে যাও, আমি নিজেই তা যাচাই করব।

হিংসুক বাদশাহর নিকট থেকে বের হয়ে সরাসরি খাদেমের কাছে গেল এবং তাকে খাওয়ার দাওয়াত দিল। হিংসুকের হিংসা ও চালবাজি সম্পর্কে খাদেমের কোন ধারণাই ছিল না। সে তো তাকে বন্ধুই মনে করত। সবার সাথেই তার ভাল সম্পর্ক ছিল। হিংসুক তাকে যে খাবার দিল তার তালিকায় কাঁচা রসুন ও পেয়াজও ছিল। খাওয়ার পর সে বাদশাহ্র দরবারে গিয়ে পৌঁছল। বাদশাহ কথা বলা শুরু করলে সে বাদশাহর জুতা হাতে নিল এবং নিজ অভ্যাস মত বলতে লাগল, 'অনুগ্রহকারীর প্রতি তার অনুগ্রহের জন্য ভাল আচরণ কর। কারণ খারাপ আচরণকারীর ধ্বংসের জন্য তার খারাপ আচরণই যথেষ্ট'।

বাদশাহ তখন তাকে বললেন, একটু আমার কাছে এসো। যখন সে বাদশাহর নিকটবর্তী হ'ল তখন তার মুখে হাত রাখল। যাতে মহামান্য বাদশাহ তার মুখ থেকে রসুন ও পেয়াজের গন্ধ না পায়।

বাদশাহ মনে মনে বললেন, তাহ'লে তো সে সত্যই বলেছে!

বর্ণনাকারী বকর বিন আব্দুল্লাহ আল-মুযানী বলেন, বাদশাহর নিয়ম ছিল, তিনি তার নিজ হাতেই শাস্তি ও সাজার কথা লিখতেন। যখন বাদশাহ স্বচক্ষে দেখলেন যে, সে আমার একনিষ্ঠ শুভাকাঙ্খী নয়; বরং ভেতরে ভেতরে আমার বিরোধিতা করে, তখন তিনি তাঁর প্রধান সেক্রেটারীকে একটি চিঠি লিখে তার হাতে দিয়ে পাঠালেন। যার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :

'চিঠি বহনকারী যখন তোমার নিকট পৌঁছবে, তখন তাকে হত্যা করে তার মরদেহ বস্তাবন্দী করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবে'।

বাদশাহ তাকে এ চিঠি দিয়ে বললেন, এটা প্রধান সেক্রেটারীর নিকট নিয়ে যাও। ঐ সীলমোহরকৃত চিঠি নিয়ে যখন সে বাদশাহ্র দরবার থেকে বের হ'ল, তখন ঐ হিংসুকের সামনে পড়ল। হিংসুক ঐ চিঠি দেখে বলল, তোমার নিকট এটা কিসের চিঠি? আমাকে একটু দেখাও তো।

সে বলল, বাদশাহ খুশী হয়ে আমাকে এটা উপহার দিয়েছেন। হিংসুক ব্যক্তিটি জবরদস্তি করে বলল, এ চিঠি আমাকে দিয়ে দাও। এক পর্যায়ে খাদেম বাধ্য হয়েই তাকে চিঠিটা দিয়ে দিল। সে চিঠি নিয়ে আনন্দচিত্তে প্রধান সেক্রেটারীর নিকট গমন করে সেটা হস্তান্তর করল। সেক্রেটারী চিঠি পাঠ করে বিস্মিত হয়ে বলল, এতো তোমার মৃত্যুর পরোয়ানা! বাদশাহর নির্দেশ, আমি যেন তোমাকে হত্যা করে তোমার মৃতদেহ বাদশাহ্র নিকট পাঠিয়ে দেই।

হিংসুক বলল, এটা আসলে আমার চিঠি ছিল না; বরং আমার অমুক বন্ধুর চিঠি ছিল। ভুলবশতঃ আমি তা নিয়ে এসেছি। প্রধান সেক্রেটারী বলল, দেখ! এখন তুমি এখান থেকে যেতে পারবে না। বাদশাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করাই আমার দায়িত্ব। সে বিভিন্ন ভাবে বুঝানোর চেষ্টা করল। বার বার অনুনয়-বিনয় করে বলল, একটি বারের জন্য আমাকে বাদশাহ্র সাথে দেখা করতে দাও। আমি প্রতারণার স্বীকার হয়েছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও।

সেক্রেটারী বলল, এ চিঠি হস্তগত হওয়ার পর তোমার ফিরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এখন মৃত্যুই তোমার শেষ পরিণতি।

অবশেষে প্রধান সেক্রেটারী তাকে হত্যা করে নির্দেশ অনুযায়ী তার মৃতদেহ বাদশাহ্র নিকট পাঠিয়ে দিল।

অন্যদিকে খাদেম নিত্যদিনের ন্যায় বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হ'ল এবং অভ্যাস অনুযায়ী ঐ প্রবাদটির পুনরাবৃত্তি করল।

বাদশাহ অবাক হয়ে বললেন, আমার চিঠি কোথায়? সে উত্তরে বলল, আমি যখন আপনার চিঠি নিয়ে বের হ'লাম তখন অমুক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হ'লে সে আমাকে আপনার পত্রটি তাকে দিতে বাধ্য করল। ফলে আমি তাকে তা দিয়ে দিয়েছি।

বাদশাহ বলল, ঐ ব্যক্তি তো আমাকে বলেছিল, তুমি আমার সম্পর্কে নাকি বল, আমার মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়? সে অবাক হয়ে বলল, কখনও না, আমি এমন কথা কখনও বলিনি।

বাদশাহ বললেন, আচ্ছা বল দেখি গতকাল যখন আমি তোমাকে ডাকলাম, তখন তুমি তোমার মুখে হাত রেখেছিলে কেন? সে বলল, মহামান্য বাদশাহ! আল্লাহ আপনাকে নিরাপত্তা দান করুন! ঐ ব্যক্তি আমাকে দাওয়াত দিয়েছিল এবং খাবারের সাথে কাঁচা রসুন ও পেয়াজ দিয়েছিল। ফলে আমি আপনার সামনে এসে মুখে হাত দিয়ে রেখেছিলাম, যাতে আপনি ঐ দুর্গন্ধ না পান।

বাদশাহ বললেন, তুমি সত্য বলেছ। তুমি আমার খাদেম হিসাবেই বহাল থাকবে। তোমার কথাই সত্য যে, অপরাধী স্বীয় অপরাধের প্রতিফল পাবেই। এজন্যই বলা হয়, যে অন্যের জন্য কূপ খনন করে সে তাতেই পতিত হয়।

** আব্দুর রহীম*
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

কবিতা

দীপ্ত ঈমান

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

সকাল সাঁঝে বদন মাঝে খই ফুটায়ে লাভটা কি?
নাই যদি সে ফুটলো কমল হৃদয় সাগরে সব ফাঁকি।
পরিচ্ছদে যায় কি পাওয়া ঈমানদারীর আসল চিন?
বেঈমানেরই রূপটা কিসে কোন রাহে পাই আসল দ্বীন?
পাঁচটি বারের ছালাতেতে হয় কি ঈমান সব পুরা?
ছালাত, ছিয়াম করলে পালন হয় কি দ্বীনের সব সারা?
কিংবা সঠিক হয় কি পালন জাল হাদীছ জাল দলীলে?
কোন রাহে হয় দীপ্ত ঈমান কোথা সঠিক দ্বীন মিলে?
পুঁজি যদি হয় বিনিয়োগ অন্য রাহের কারবারে,
মনের তরী যায় চলে যায় আল্লাহ্র অহি-র সব দ্বারে,
শক্তিতে আর ভক্তিতে রয় আল্লাহ ছাড়া অন্য দ্বীন,
ছালাত, ছিয়াম, তাসবীহ-যিকির হবে যে ভাই সব মলিন।
বিদ'আত আর শিরকে যাদের ভর জীবনের ইবাদত
কাজ হবে না ব্যর্থ হবে যতই করো দিন কি রাত।
আল্লাহ্র পথে জান বিকাতে মাল বিকাতে পারলো যে,
শয়তানের ঐ বিপক্ষেতে জোরছে অসি ধরলো যে।
শিরক-বিদ'আতীর কেল্লাগুলো গুড়িয়ে যে দেয় আস্তানা
ধরার ধূলায় মিশায় যে জন আযাযীলের কারখানা।
সেই তো পারে দ্বীনের তীরে নাও ভিড়াতে জীবন ভর,
আল্লাহ্র রহমত তার পরেতে জান্নাতেরই মুক্ত দ্বার।
রাসূল (ছাঃ) প্রেমে নিজের জীবন হাসতে হাসতে করলো দান
সেই জনাই স্বাদ পেয়েছে কোনটা আসল ঠিক ঈমান।

***

তোমার নামে

ইয়াকূব আলী
বাংলামটর, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

তোমার নামে শক্তি পাই
তুমি অতি মহান,
সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছো
এই বিশ্ব জাহান।

তোমার নামে যিকির করে
পশু পাখি জিন ইনসান,
সত্য-ন্যায়ের পথে চলতে
নাযিল করলে আল-কুরআন।

তোমার নামে আযান হয়
দৈনিক পাঁচ বার,
ওযূ করে মসজিদে যাই
পড়ি ছালাত বার বার।

আল্লাহ তোমার রহম পেয়ে
যেন মৃত্যু হয়,
পরোকালে শেষ বিচারে
শান্তি যেন পাই।

***

হে যুবক তুমি জেগে উঠ

তামান্না বিনতে আব্দুল মতীন
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

হে যুবক!
আর কতকাল ঘুমিয়ে কাটাবে, জাগবে না কি তুমি?
চেয়ে দেখ আজ পৃথিবীটা যেন ঈমানহীন মরুভূমি
পৃথিবীর বুকে ঘটছে কত অন্যায়-অবিচার
রাহাজানি, খুন, ধর্ষণ অশ্লীল কারবার।

হে যুবক!
তুমি থাকতে কেন মোদের অনাচার দেখতে হয়?
ভুলে কি গিয়েছ কোন জাতি তুমি, কি তোমার পরিচয়?
জাতির খ্যাতি ধূলায় উড়িয়ে করেছ একি হাল?
অশ্লীলতা বেহায়াপনায় হয়েছ বেসামাল।
আজকে তোমার রংচটা প্যান্ট টাখনুর নিচে ঝুলে
শার্ট গায়ে বুক খুলেছ রং করেছ চুলে।
ঠোঁটে তোমার স্থান পেয়েছে জ্বলন্ত সিগারেট
তোমায় দিয়ে পূরণ হ'ল শয়তানের টার্গেট।
স্থান পেয়েছে তোমার চোখে সানগ্লাস ঐ কালো
মস্ত বড় গুণ্ডা সেজে ইবলীস হয়ে চল!
এ জীবন তোমার দ্বীনের পথে বিলিয়ে দিতে হ'ত
জা'ফর, যায়েদ, খুবায়েব, হামযাহ, আম্মারের মত।
কাফিররা কেটে টুকরা করেছে শহীদ হামযার লাশ
ভুলে যেও না বিন রাওয়াহার শহীদী ইতিহাস।
আল্লাহ্র দ্বীনকে করতে ক্বায়েম হানযালা যে ছুটে
সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী ঘরে তার খেয়াল নেই সেদিকে মোটে।
রণক্ষেত্রে হানযালা হায় শহীদ হয়ে যায়,
নববধূ নিয়ে ঘর বাঁধার আর সুযোগ হ'ল না তায়।
ক্ষুধার তাড়নায় আবু হুরায়রা মাটিতে থাকতেন পড়ে
পদদলিত করত লোকেরা তাকে পাগল মনে করে।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘরে আগুন জ্বলেনি বহুদিন বয়ে যায়
জীবন থাকতে পেট পুরে তিনি খাবার খাননি হায়!

হে যুবক!
আজ যে তুমি ভোগ-বিলাসে জড়িয়ে গেছ খুব
দিনে দিনে কেবল বাড়ছে তোমার অর্থ-সম্পদের লোভ।
শেয়ার ব্যবসা, এম.এল.এম-এ যোগ দিয়েছ তাই
হালাল-হারাম বিচার করার জ্ঞান কি তোমার নাই?
লক্ষ-কোটি টাকা দিয়ে লাভ কি তোমার হবে?
ছাহাবীদের চেয়ে উন্নত তুমি কি হ'তে পারবে?
পূর্ব আকাশের সূর্য যেমন আঁধার মাড়িয়ে জ্বলে
পঙ্কিলতা দূরে ঠেলে দাও ঈমানী আলোর বলে।
জাতির প্রদীপ হয়ে আবারো তোমায় জ্বলতে হবে
প্রয়োজন হ'লে জীবন দিতে প্রস্তুত তুমি রবে।
আর দেরী নয় জেগে উঠ তুমি ধর ঈমানের হাল
পৃথিবীর বুকে বুনে দাও তুমি দৃঢ় ঈমানী জাল।

***

Contents

বর্ষবরণ ঈমান হরণ

*শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন**

উৎসব মানুষের প্রাণের চাহিদা। আনন্দের খোরাক। ক্লেশ-ক্লান্তি ভুলার উপায়। আমেজে ডুব দিয়ে মনকে সজীব করার মাধ্যম। সে দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম মানুষের জন্য সার্বজনীন উৎসবের ব্যবস্থা করেছে দুই ঈদ প্রবর্তনের মাধ্যমে। এ তো শুধু উৎসব নয়; বরং দুই ঈদকে যারা সুন্নাহ ভিত্তিক উদযাপন করতে পেরেছেন, তারাই উপলব্ধি করেছেন এলাহী উৎসবের শীতলতা কত! কত প্রশান্তি দায়ক! অথচ হালে দেখা যায়, উৎসব মানে বাদ্য-বাজনার আবশ্যিক ব্যবহার, প্রায় নগ্ন নারীর বাধাহীন মিশ্রণ, তরুণ-তরুণীর বেসামাল কীর্তিকলাপ, উচ্চশব্দে ইবলীসের হাসি ও জম্পেশ আড্ডা ইত্যাদি। এসব ব্যতীত যেন উৎসব অচল, নিরস, প্রাণহীন।

পহেলা বৈশাখ! লোকে বলে, এটা নাকি একমাত্র অসাম্প্রদায়িক মহা উৎসব। যেখানে নেই কোন ধর্মের ভেদ, নেই জাতির। একুল বাংলা ওকুল বাংলা দুই বাংলার মেলবন্ধন। সাম্যবাণী বৈকি! এরা অসাম্প্রদায়িক শব্দটি দিয়ে কী বুঝাতে চায়? এরা চায় সকল ধর্মের সাথে মিলেমিশে খিচুড়ী মার্কা একটা উৎসবের। যে উৎসব সকলের মধ্যকার ছেদ-পার্থক্য দূর করে একাকার করে দিবে। ভেঙ্গে দিবে ধর্মের প্রাচীর। আসুন! ঘেটে দেখা যাক, বর্ষবরণের এমন উৎসবে মেতে উঠা সঙ্গত কি-না।

বাংলা সনের উৎপত্তি :

মোঘল সম্রাট আকবরের হাত ধরে বাংলা সনের পথচলা। বাংলা সন প্রবর্তনের পিছনে প্রধানত দু'টি কারণ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ আকবরের শাসনকার্য হিজরী সন অনুযায়ী পরিচালিত হ'ত। এতে খাজনা আদায়ে অসুবিধার সৃষ্টি হ'ত। কারণ চান্দ্রবর্ষ প্রতি বছর ১০/১১ দিন এগিয়ে যায়। এটি আল্লাহ্র বিশেষ করুণা যে, তিনি ইবাদতকে চন্দ্রের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। এতে করে যুগ পরিক্রমায় আরবী মাসগুলো সব ঋতুতেই আসে। সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত হলে চিরকালই এক মওসুমে ছিয়াম অথবা অন্যান্য ইবাদত পালন করতে হ'ত। কারণ সূর্যের সাথে সৌরবর্ষের হিসাব থাকায় দিন-মাস-ঋতুর গণনা সব সময় একই থাকে। শস্য উৎপাদন ও খাজনা আদায়ের সমন্বয় সাধনের জন্য সম্রাট আকবর সৌরবর্ষের হিসাবে বাংলা সালের প্রবর্তন করেন।[৫৮]

ইতিহাসে দ্বিতীয় যে কারণটির উল্লেখ রয়েছে, তা হল- আকবরের ছিল পাঁচ শতাধীক স্ত্রী।[৫৯] মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন নানা ধর্মের স্ত্রীদের মধ্যে হিন্দুপ্রধান দেশ ভারতে আকবরের হিন্দু স্ত্রীদের সংখ্যা ছিল বেশী। মুসলিম শাসক আকবরের হেরেমে সকল স্ত্রী নিজ নিজ ধর্ম পালন করত। পৃথক পৃথক উপাসনালয় ছিল তাদের জন্য। তবে আকবরের জীবনে হিন্দুয়ানী ষ্টাইল আছড়ে পড়ে মূলতঃ হিন্দু স্ত্রীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে। তৎকালীন হিন্দুরা আকবরের নিকট দাবী জানায়, যীশুখৃষ্টের সাথে খৃষ্টাব্দ, মুহাম্মাদের সাথে হিজরী সাল জড়িত। আমাদের জন্য পৃথক কিছু নেই। অথচ হিন্দু হিতৈষী বাদশাহ হিসাবে হিন্দুদের কল্যাণে আপনার পৃথক সালের ব্যবস্থা করা উচিত। অতঃপর তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে প্রবর্তন করা হল 'তারিখ-ই-ইলাহী' সনের।[৬০] এটিই পরবর্তীতে 'ফসলী সন', অতঃপর 'বাংলা সন' বা বঙ্গাব্দ নামে প্রচলিত হয়। উল্লেখ্য, সম্রাট আকবরের নির্দেশে বাংলা সনের উক্ত ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করেন তৎকালীন পণ্ডিত, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফতেহ উল্লাহ সিরাজী।

আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর মোতাবেক হিজরী ৯৬৩ সালের মুহাররম মাসে। তখনো বঙ্গে শকাব্দ চালু ছিল যার শুরুর মাস ছিল চৈত্র। শকাব্দ হল- মধ্য এশিয়ার প্রাচীন রাজা 'শক' কর্তৃক প্রবর্তিত সাল। এটি বাংলা সাল থেকে ৫১৫ বছর বেশী ও খৃষ্টসাল থেকে ৭৮ বছর কম (অর্থাৎ ১৪২১+৫১৫/২০১৪-৭৮=১৯৩৬, এখন শকাব্দ ১৯৩৬)।

আকবরের সিংহাসনারোহণের মাস মুহাররমের সাথে শকাব্দের বৈশাখ মাস পড়ে যাওয়ায় তিনি 'তারিখ-ই-ইলাহী' বা ফসলী সনের শুরু করেন বৈশাখ মাস দিয়ে। সেই থেকে চৈত্রের পরিবর্তে বৈশাখ দিয়ে শুরু হয় নতুন বছর। আববরের আদেশে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ৯৯২ হিজরীতে ফসলী সন বা বাংলা সনের ফরমান জারী হয়। ৯৯২ হিজরীতে আদেশ জারী করলেও ৯৬৩ হিজরীতে আকবরের সিংহাসন আরোহণের সাল থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। ৯৬৩ সালে বাংলা ও হিজরী সাল একই ছিল। অতঃপর হিজরী সাল প্রতি বছর ১০/১১ দিন এগিয়ে যাওয়ায় (২০১৪ইং/১৪২১ বঙ্গাব্দ-৯৬৩) ৪৫৯ বছরে হিজরীবর্ষ এগিয়ে গেছে ১৫ বছর। ফলে এখন বাংলা ১৪২১ আর আরবী ১৪৩৬।

ইংরেজী সালের বর্তমান রূপ যেভাবে এল :

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্য আমেরিকার মেক্সিকোতে এক উচ্চমান সভ্যতা ছিল। যার নাম 'মায়া সভ্যতা'। মায়াদের সংখ্যা তাত্ত্বিক জ্ঞান, গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে অসাধারণ দক্ষতা, শিল্পকলার উন্নতি ইত্যাদিতে ইতিহাস বিস্মিত। তারাই প্রথম আবিষ্কার করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন।

বলা হয়ে থাকে, নিজেদের গণনার সুবিধার্থে সর্বপ্রথম রোমানরা ক্যালেন্ডার তৈরী করে। তাতে বছরের প্রথম মাস ছিল মারটিয়াস। যা বর্তমানের মার্চ মাস। এটি তাদের যুদ্ধ দেবতার নামানুসারে নামকরণ করা হয়। অতঃপর খৃষ্টপূর্ব ১ম শতকে জুলিয়াস সিজার কয়েক দফা পরিবর্তন ঘটান ক্যালেন্ডারে। তৎকালীন প্রখ্যাত জোতির্বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় তিনিই প্রথম ক্যালেন্ডারে (মায়াদের আবিস্কৃত সূর্যকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ কাল) ৩৬৫ দিন ব্যবহার করেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার উদ্ভাবিত 'জুলিয়ান ক্যালেন্ডার' বাজারে প্রচলিত থাকে। বহুকাল পরে এই ক্যালেন্ডার সংশোধন করে নতুন একটি ক্যালেন্ডার চালু হয়। দু'জন জোতির্বিজ্ঞানীর সাহায্যে খৃষ্টধর্মের ত্রয়োদশ পোপ গ্রেগরী ১৫৭৭ সালে জুলিয়াস প্রবর্তিত প্রচলিত ক্যালেন্ডারটিতে পরিবর্তন আনেন। অবশেষে ১৫৮২ সালে আরেক দফা সংস্কার করে বর্তমান কাঠামোতে দাঁড় করান। পরিবর্তিত এ ক্যালেন্ডারে নতুন বর্ষের শুরু হয় জানুয়ারী দিয়ে, যা গ্রীকদের আত্মরক্ষার দেবতা 'জানুস'-এর নামে রাখা হয়। আমাদের ব্যবহৃত বর্তমান ইংরেজী ক্যালেন্ডারটি 'গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার'। প্রায় সারাবিশ্বে প্রচলিত ইংরেজী ক্যালেন্ডার এখন এটিই।

ইংরেজী সালের সাথে বাংলা সালের সমন্বয় :

** শিক্ষিকা, মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

৫৮. *বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ এপ্রিল ২০১৪, পৃঃ ৭।*

৫৯. *Akber had over five thousand wives. Vindication of Hurangz. p. 143.*

৬০. *গোলাম আহমাদ মোর্তাযা, ইতিহাসের ইতিহাস, পৃঃ ১০৫।*

ইংরেজী সালের মত বাংলা সালেও ৩৬৫ দিন। মূলতঃ পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসতে সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৬ ঘণ্টা। চার বছর পর এই ৬ ঘণ্টা ১ দিনে পরিণত হয়ে ৩৬৬ দিন হয়ে যায়। ইংরেজী ১২ মাসের মধ্যে ৭ মাস ৩১ দিনে (৭×৩১=২১৭), ৪ মাস ৩০ দিনে (৪×৩০=১২০), ফেব্রুয়ারী মাস ২৮ দিনে মোট (২১৭+১২০+২৮)= ৩৬৫ দিন। চার বছর পর ফেব্রুয়ারী মাস ২৯ দিনে হয়। যে বছর ফেব্রুয়ারী মাস ২৯ দিনে হয় সে বছরের দিন সংখ্যা হয় ৩৬৬ এবং বছরটির নাম Leapyear। ২৯ ফেব্রুয়ারীর দিনটির নাম Leap day। জুলিয়ান ক্যালেন্ডার থেকে এই নিয়মটি প্রচলিত হয়ে আসছে।

বাংলা সালের সাথে খৃষ্টাব্দের মিল করতে ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহকে প্রধান করে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটি ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ সালে বাংলা সালের সংস্কার করেন এভাবে-

১. বছরের প্রথম পাঁচ মাস (বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র) গণনা হবে ৩১ দিনে।

২. পরের সাত মাস (আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র) গণনা হবে ৩০ দিনে।

৩. ইংরেজী লিপ ইয়ারে বাংলা ফাল্গুনের সাথে ১ যোগ হয়ে ৩১ দিনে হবে।

এই সংস্কারের ফলে এখন প্রতি ইংরেজী বছরের ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীরা এ সংস্কার গ্রহণ করেনি। ফলে বাংলা সাল হ'লেও তাদের সাথে তারিখে আমাদের মিল নেই।

বৈশাখ উদযাপনের গোড়ার কথা :

সম্রাট আকবরের সময়কাল থেকেই পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয়। চৈত্রের শেষ দিনে বঙ্গের জমিদারদের নিকট প্রজারা তাদের সকল খাজনা, মাশুল, শুল্ক পরিশোধ করত। পরদিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ তারা উৎসবের আয়োজন করত। মূলতঃ তাদের এদিনের প্রধান কাজ ছিল একটি হালখাতা তৈরী করা। হালখাতা মানে বর্তমান খাতা বা নতুন হিসাব বহি। অর্থাৎ নতুন বছরের যাবতীয় হিসাব নতুন করে শুরু করার খাতা। এটা হল পহেলা বৈশাখ উদযাপনের প্রচলিত ইতিহাস।

গভীরে যে কথা রয়ে গেছে তা হল, হিন্দু হিতৈষী শাসক সম্রাট আকবরের রূহে হিন্দুয়ানা গুলে ছিল। তার উদ্ভাবিত মিকশ্চার ধর্ম 'দ্বীন-ই-ইলাহী'র মত সব ধর্মের অংশগ্রহণে একটি উৎসব হওয়া তার কাম্য ছিল। বৈশাখের অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে তার আকাংখিত মিকশ্চার উৎসব। এতে তার হিন্দু স্ত্রী ও হিন্দু প্রজারা বেশী উৎফুল্ল হয়। কারণ তাদের দাবীর প্রেক্ষিতেই এই সালের উৎপত্তি এবং এমন সার্বজনীন উৎসব!

বর্ষবরণ হয় যেভাবে :

ভারতীয় উপমহাদেশে বর্ষবরণ হয় দুইবার। একবার তাবৎ বিশ্বের সাথে ইংরেজী নববর্ষ উদযাপন। নিজস্ব সংস্কৃতিতে আরেকবার বৈশাখ উদযাপন। অবশ্য বৈশাখ উদযাপনটাই যেন বাঙ্গালির 'অবশ্য পালনীয়' হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৈশাখ মাতাল জনৈক লেখক পহেলা বৈশাখের চিত্রাঙ্কনে লিখেছেন- 'শিশুরা খেলছে, বড়রা বেড়াচ্ছে, প্রেমিক-প্রেমিকারা কূজনে মগ্ন, খুশিতে, লাবণ্যে, মাধুর্যে সব পরিবেশ ঝলমল করে উঠে। ওরা না থাকলে যেন মিথ্যে হত আকাশের তারা ফোটা, মিথ্যে হত জীবনের মানে'।[৬১]

ইংরেজী নববর্ষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে পালিত হয়। আমেরিকাতে হয় সবচেয়ে বড় নিউইয়ার পার্টি- যাতে ৩০ লাখ লোক অংশগ্রহণ করে। অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে প্রায় ১৫ লাখ লোকের উপস্থিতিতে ৮০ হাযারের মত আতশবাজি ফুটানো হয়। মেক্সিকোতে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২-টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ১২-টা ঘণ্টা ধ্বনি বাজানো হয়। প্রতি ঘণ্টা ধ্বনিতে ১টি করে আঙ্গুর খাওয়া হয়, আর মনে করা হয়, যে উদ্দেশ্যে আঙ্গুর খাওয়া হবে সে উদ্দেশ্য পূরণ হবে। ডেনমার্কে আবার কেমন লঙ্কাকাণ্ড! ডেনিশরা প্রতিবেশীর দরজায় কাঁচের জিনিসপত্র ছুড়তে থাকে। যার দরজায় যতবেশী কাঁচ জমা হবে, নতুন বছর তার তত ভাল যাবে। আর কোরিয়ানরা যৌবন হারানোর ভয়ে রাতে ঘুম থেকে বিরত থাকে। তাদের বিশ্বাস বছর শুরুর সময় ঘুমালে চোখের ভ্রূ সাদা হয়ে যায়। বাংলাদেশে রাত বারটা বাজার সাথে সাথে আতশবাজি, নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড়, উন্মত্ততা শুরু হয়। নতুন পোশাক, ভাল খাবার, বিভিন্ন স্পটে ঘুরতে যাওয়া, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাদির মধ্যদিয়ে পালিত হয় ইংরেজী নববর্ষ।

অপরদিকে বাংলাদেশে বৈশাখ বরণের চিত্রও ভয়াবহ। পহেলা বৈশাখ শুরু হয় ভোরে। সূর্যোদয়ের পর পর। মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় ৩১ চৈত্র; চৈত্র সংক্রান্তির মধ্য দিয়ে। চৈত্র সংক্রান্তি মানে চৈত্রের শেষদিন। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চৈত্রকে বিদায় ও নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয়। সূর্যাদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ানটের শিল্পিরা বিশ্বকবির বৈশাখী গান 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো...' গেয়ে সূর্যবরণের মাধ্যমে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়।

জানা প্রয়োজন, রমনার বটমূল পহেলা বৈশাখের ধমনী। যে গাছের ছায়ায় ছায়ানটের মঞ্চ তৈরী হয় সেটি বট গাছ নয়। অশ্বত্থ গাছ। সুতরাং বটমূল নয় অশ্বত্থমূল। বটমূল হল প্রচলিত ভুল শব্দের ব্যবহার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ থেকে বৈশাখের প্রধান আকর্ষণ 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' বের হয়। দেশের সমৃদ্ধি কামনায় শোভাযাত্রা বের হয় বলে এর নাম 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'। হাযার হাযার মানুষের অংশগ্রহণে মূর্তি-মুখোশ মিছিলে ঢাক-ঢোল, কাঁসা-তবলার তালে তালে চলতে থাকে সঙ্গীত-নৃত্য, উল্লাস-উন্মত্ততা। এ শোভাযাত্রায় এ বছরের শ্লোগান ছিল, 'জাগ্রত কর, উদ্যত কর, নির্ভর কর হে'। লক্ষণীয় যে, মঙ্গল শোভাযাত্রার মঙ্গল কামনার প্রতীক হল চারুকলার ম্যাসব্যাপী পরিশ্রমে বানানো ঘোড়া, হাতি, ময়ূর, পেঁচা, পুতুল, পাখি, মূর্তি, বিভিন্ন মুখোশ প্রভৃতি।

প্রিয় পাঠক! বৈশাখী অনুষ্ঠানের শুরুটাতেই হয়ত টের পেয়েছেন এটি যে সূর্যপূজা। এছাড়া বিনোদনের নামে পালনীয় কার্যক্রমেও হয়তো লক্ষ্য করেছেন হিন্দু কালচারের সফল বিচরণ। তারা বাঙ্গালী হ'তে গিয়ে হিন্দু রীতির লৌহ নিগড়ে নিজেকে জড়িয়ে অসাম্প্রদায়িক হ'তে চাইছেন। আসলে অসাম্প্রদায়িকতাটা কি? এটি কি সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষতা? যদি তাই হয়, তবে বৈশাখের আহ্বান ধর্মনিরপেক্ষতার আহ্বান নয় কি? দুর্ভাগ্য হতভাগা মুসলমানদের, যারা নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে হিন্দু সংস্কৃতির ধারক-বাহক সেজেছে।

পান্তা-ইলিশ যেভাবে :

---

৬১. *নয়াদিগন্ত, ১৪ এপ্রিল, পৃঃ ৭।*

সব কিছু ছাপিয়ে পানতা-ইলিশ হয়ে ওঠেছে বৈশাখের এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। ইট-বালিতে সিমেন্টের ন্যায়। পান্তা-ইলিশ বিহীন বৈশাখের গাথুঁনী যেন বালুময়, খড়খড়ে, ক্ষীয়মান। বৈশাখে পান্তা-ইলিশের সংযোজনকারীদের অন্যতম সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল নিজেই উল্লেখ করেছেন কিভাবে তারা এর সূচনা করেন। তার জবানীতে ঘটনাটি এরূপ- ৫ সেগুনবাগিচা বর্তমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ছিল দৈনিক দেশ এবং সাপ্তাহিক বিপ্লবের কার্যালয়। সেকারণেই সেখানে বসত লেখক আড্ডা। আমি ছিলাম একজন নিয়মিত আড্ডারু। ১৯৮৩ সাল। চৈত্রের শেষ। চারদিকে বৈশাখের আয়োজন চলছে। আমরা আড্ডা দিতে দিতে পান্তা-পিয়াজ-কাঁচা মরিচের কথা তুলি। দৈনিক দেশের (প্রয়াত) বোরহান ভাই রমনা বটমূলে পান্তা-ইলিশ চালুর প্রস্তাব দিলেন। আমি সমর্থন দিলাম। প্রথমে আমাকে দায়িত্ব নিতে বললেন। কারণ সেই আড্ডায় আমিই একমাত্র বহিরাগত। ফলে কাজটা সম্পাদন করতে সুবিধা হবে। আমি একা রাজি না হওয়ায় কবি ফারুক মাহমূদ আমাকে নিয়ে পুরো আয়োজনের ব্যবস্থা করলেন। নিজেদের মধ্যে পাঁচ টাকা করে চাঁদা তোলা হল। বাজার করা আর রান্না-বান্নার দায়িত্ব দিলেন বিপ্লব পত্রিকার পিয়নকে।

প্রথমে আমরা পান্তা আর ডিম ভাজা দিতে চাইলাম। কিন্তু ডিমের স্থলে স্থান পেল জাতীয় মাছ ইলিশ। রাতে ভাত রেঁধে পান্তা তৈরী করে, কাঁচা মরিচ, শুকনো মরিচ, পেঁয়াজ, ইলিশ ভাজা নিয়ে 'এসো হে বৈশাখের আগেই ভোরে আমরা হাজির হ'লাম বটমূলের রমনা রেষ্টুরেন্টের সামনে। সঙ্গে মাটির সানকি। মুহূর্তের মধ্যে শেষ হলো পান্তা-ইলিশ। এভাবে যাত্রা শুরু হলো পান্তা-ইলিশের *(বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১)*।

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের ইসলামী মূল্যায়ণ :

বিশেষ সময়কে উদযাপন ও সূর্যকে আহ্বান : ইংরেজী নববর্ষের শুরু হয় ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২-টা ০১ মিনিটে। আর তখন থেকেই শুরু হয় আতশবাজি, বাদ্য-বাজনা, নাচ-গান, যুবক-যুবতীর ফ্রি স্টাইল ফূর্তি। উল্লাস আর বেলেল্লাপনায় কেটে যায় সারাটি রাত।

রাতের গুরুত্বপূর্ণ যে সময়টিকে তারা টগবগে যৌবনের লাগামছাড়া নেশা মেটানোর সময় হিসাবে বেছে নিয়েছে সে সময়টিতে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে এসে আহ্বানকারীকে, অসুস্থকে, ক্ষমাপ্রার্থীকে যা ইচ্ছা তা ডেকে ডেকে দিয়ে যান।[৬২] মহান স্রষ্টার আহ্বানকে উপেক্ষা করে যারা শয়তানের আহ্বানে রাত জাগে, তাদের পরিণাম আল্লাহ্র কাছে কি-ই বা হবে?

বাংলাদেশে ইংরেজী নববর্ষের চেয়ে বাংলা নববর্ষ অনেক বেশী সাড়ম্বরে পালিত হয়। সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ছায়ানট' এর শিল্পীরা রমনা বটমূলে রবীন্দ্রনাথের গান এবং ধানমণ্ডী রবীন্দ্র সরোবরে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানোর মধ্য দিয়ে নববর্ষের সূচনা করে। নববর্ষের শুভ কামনায় বের করা হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। বাংলা নববর্ষে সূর্যোদয়ের সময়টিকে কল্যাণের জননী হিসাবে বেছে নিয়ে সূর্যকে আহ্বান করা হয়। এরূপ শুভাশুভ নির্ণয় ও তাতে বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ 'কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক'।[৬৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ، أَوْ تُطِيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ، أَوْ تُكِهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ، أَوْ سُحِرَ لَهُ 'যে কুলক্ষণে বিশ্বাস করে এবং যাকে সে বিশ্বাস করায়, যে ভাগ্য গণনা করে এবং যাকে সে ভাগ্য গণনা করে দেয়, যে জাদু করে এবং যাকে সে জাদু করে দেয়- তারা আমাদের (উম্মাতে মুহাম্মাদীর) অন্তর্ভুক্ত নয়।[৬৪]

কোন সময়কে অশুভ বা শুভ মনে করা হিন্দু সংস্কৃতিধারী মুসলিমের কাজ। বরং বিশেষ যে সময়ের কথা হাদীছে এসেছে তা নিম্নরূপ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِى اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. 'রাতের মধ্যে এমন একটি সময় আছে, যদি কোন মানুষ সে সময় লাভ করতে পারে, তবে আল্লাহ্র নিকট ইহকাল ও পরকালের কোন কল্যাণ চাইলে আল্লাহ তাকে দান করেন। আর এ সময়টি প্রতি রাতেই রয়েছে।[৬৫]

জুম'আর দিন সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيْهِ خَمْسُ خِلاَلٍ خَلَقَ اللهُ فِيهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ إِلَى الأَرْضِ وَفِيهِ تَوَفَّى اللهُ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللهَ فِيْهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلاَ سَمَاءٍ وَلاَ أَرْضٍ وَلاَ رِيَاحٍ وَلاَ جِبَالٍ وَلاَ بَحْرٍ إِلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

'জুম'আর দিন সকল দিনের সরদার এবং আল্লাহ্র নিকট বেশী সম্মানিত। এটা কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন অপেক্ষাও আল্লাহ্র নিকট অধিক সম্মানিত দিন। তাতে পাঁচটি গুরুত্ব রয়েছে। এদিনে আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন, এদিনেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, এদিনেই তার মৃত্যু হয়েছে। এ দিন এমন একটি সময় আছে এ সময়ে আল্লাহ্র কাছে কিছু চাইলে তা পাওয়া যাবে, যদি তা হারাম না হয়। এ দিন ক্বিয়ামত সংগঠিত হবে। এ দিন ফেরেশতা, আকাশ, পৃথিবী, বাতাস, পাহাড়, সমুদ্র সব কিছুই ভীত থাকে।[৬৬]

মুসলিম জীবনে আরেকটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে- 'যা এক হাযার মাসের চেয়েও উত্তম' *(ক্বদর ৩)*। এটিকে রামাযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিতে অনুসন্ধান করতে আদেশ দেয়া হয়েছে।[৬৭] এছাড়া মুসলিম জীবনে আর কোন বিশেষ মুহূর্ত নেই- যেটাকে মানুষ অনুসন্ধান করতে পারে। বস্তুতঃ মানব জীবনের পুরো সময়টাই হীরন্ময়। যা একবার গত হলে আর কখনো ফিরে আসে না। বরং বিশেষ সময়কে এভাবে উদযাপন করা শিরকী সংস্কৃতি বৈ কিছুই নয়।

প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আবির্ভূত ইসলামকে যারা সেকেলে মনে করে, ইসলামের নবায়নের জন্য মরিয়া যারা, তারাই আবার হাযার হাযার বছরের পুরোনো সূর্য পূজাকে নিজস্ব সংস্কৃতিতে

---

৬২. *মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩*।
৬৩. *আবু দাঊদ হা/৩৯১২; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৩৮; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৮৪*।
৬৪. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৯৫*।
৬৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৪*।
৬৬. *ইবনু মাজাহ হা/১০৮৪; মিশকাত হা/১৩৬৩*।
৬৭. *বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৮৩, ৪/২৬৫*।

ঢুকিয়ে আধুনিক হওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। খৃষ্টপূর্ব ১৪ শতকে মিশরীয় 'অ্যাটোনিসম' মতবাদে সূর্যের পূজা হ'ত। ইন্দো-ইউরোপীয় এবং মেসো আমেরিকান সংস্কৃতিতে সূর্য পূজারীর অস্তিত্ব রয়েছে। খৃষ্টানদের ধর্মীয় উৎসব ২৫ ডিসেম্বর 'বড় দিন' পালিত হয় মূলতঃ রোমক সূর্য পূজারীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুসরণে- যীশু খৃষ্টের প্রকৃত জন্ম তারিখ থেকে নয়।

অথচ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত্রি-দিন, সূর্য-চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না। সিজদা কর আল্লাহকে- যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর *(৪১ঃ৩৭)*।

সাবার রাণী বিলকিসের এরূপ কর্মকাণ্ডকে তিরস্কার করে আল্লাহ বলেন, 'আমি তাকে ও তার জাতিকে দেখলাম তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের কর্মকাণ্ডকে তাদের নিকট সুন্দর করেছে এবং তাদেরকে বিরত রেখেছে ফলে তারা সৎপথ পায়নি' *(নামল ১৪)*।

মূলতঃ দুই ঈদ ব্যতীত মুসলিম জীবনে আর কোন ধর্মীয় উৎসব নেই। এছাড়া সংস্কৃতির নামেই হোক আর ধর্মের নামেই হোক- সব ধরনের উৎসব পরিত্যাজ্য। বৈশাখ বরণের নামে নতুন বছরের সূর্যকে স্বাগত গানে সম্ভাষণ জানানো, মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন, মঙ্গল শোভাযাত্রা প্রদর্শন- এগুলো পৌত্তলিক, সূর্যপূজারীদের ধর্মীয় আচার। এসব অনুষ্ঠান কখনো মুসলিম সংস্কৃতির অংশ নয়; হতে পারে না। কত মায়ের সন্তান যে মুশরিকত্ব বরণের উৎসবে আটকা পড়েছে- তা ভাবার কেউ নেই। ধর্মহীনতার চোরাবালিতে তারা তলিয়ে যাচ্ছে। আর তারা সার্বজনীন উৎসবের নামে একতার বাণীতে শান দিচ্ছে। মেকী ঈমানের পরহেযগার ব্যক্তিরা হৃদস্পন্দন বন্ধ হওয়ার আগে উপলব্ধি করবে কি?

বাদ্য-বাজনার ব্যবহার :

বর্ষবরণের এসব অনুষ্ঠানে গান-বাজনা যেন পূর্বশর্ত। ঢেউ খেলানো আনন্দে বাজনা-সঙ্গীত যেন ফেনিল রাশি হয়ে বয়ে চলে। অথচ বাদ্য-বাজনার ব্যবহার ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنٌ 'এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অজ্ঞভাবে অনর্থক কথা (বাদ্য-বাজনা) ক্রয় করে এবং তাকে আনন্দ-ফূর্তি হিসাবে গ্রহণ করে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি *(লুকমান ৩১/৬)*।

আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ تعالى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَقال : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মদ, জুয়া ও সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন'।[৬৮]

নাফে' (রাঃ) বলেন, একদিন ইবনু ওমর (রাঃ) বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেয়ে দুই কানে দুই আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা থেকে সরে যান। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, নাফে' তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ কি? আমি বললাম, না। তখন তিনি তার দুই আঙ্গুল দুই কান হতে বের করে বললেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম তিনি বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনে কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা থেকে সরে গিয়েছিলেন এবং আমাকে এভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যেভাবে আজ তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম।[৬৯]

মূর্তি-রেপলিকা ব্যবহার :

মূর্তি-রেপলিকা ব্যবহার বৈশাখের আরেকটি অপরিহার্য অংশ। ১৯৮৬ সালে সর্বপ্রথম যশোরে মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রচলন ঘটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টস ইনসটিটিউটের কিছু ছাত্র যশোর 'চারুপীঠ' নামের একটি সংস্কৃতিশালা গড়ে তোলে। চারুপীঠের উদ্যোগে প্রদর্শিত এ শোভাযাত্রায় উদ্যোক্তারা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ফুল-পাখি, ভূত-প্রেত-দানব, ও জীব-জন্তুর রেপলিকা-মুখোশ ব্যবহার করে *(পরবর্তীকাল থেকে অবশ্য মূর্তি-মুখোশ মঙ্গল কামনার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে)*। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা থেকে ১৯৮৮ সালে এ শোভাযাত্রা বের হয়। তাতে ব্যবহৃত হয় চারু শিল্পীদের তৈরী দশটি ছোট আকৃতির ঘোড়া, একটি বিরাটাকার হাতি, (যাকে হিন্দুরা গণেশ বলে পূঁজা করে) এছাড়া ৫০টি মুখোশ। অনেকেই জানে না এ শোভাযাত্রায় কেন মুখোশ-মূর্তি ব্যবহৃত হয়। তাতে শামিল হওয়ার ফলইবা কি? অথচ অজান্তে অসম্ভব শাস্তির দিকে যাত্রা করেছে তারা। যাত্রা করেছে বরকতহীনতার দিকে।

ছবি-মূর্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً، عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ 'যে ব্যক্তি একটিমাত্র ছবি তৈরী করবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাতে আত্মা দিতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু তার জন্য এটি কখনোই সম্ভব নয়'।[৭০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে রহমত ও বরকতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।[৭১]

নগ্ন নারীর পুংমিশ্রণ :

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে যুবক-যুবতীদের অবিমিশ্রণ জাহেলিয়াতকেও হার মানায়। নারী নগ্নতার এই অপসংস্কৃতি দেশকে দ্রুত নিয়ে যাচ্ছে নিম্ন সংস্কৃতিতে। নতুন প্রজন্মের জন্য চরিত্রবান মায়ের সংকট তৈরী করছে তারা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন- দুই শ্রেণীর জাহান্নামী রয়েছে, যাদের আমি এখনও দেখিনি। এমন সম্প্রদায়, যাদের হাতে গরু পরিচালনা করার লাঠি থাকবে। তা দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করবে। আর নগ্ন পোষাক পরিধানকারী নারী, যারা পুরুষদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে এবং নিজেরাও পুরুষের দিকে আকৃষ্ট হয়। তাদের মাথা বক্র উঁচু কাঁধ বিশিষ্ট উটের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ উহার সুগন্ধি এত এত দূর থেকে পাওয়া যায়'।[৭২]

অত্র হাদীছে আঁটসাঁট, অশালীন, অমার্জিত পোষাক পরিধানকারী দুর্বলচিত্ত, মাথার চুল উপরে তুলে বাধা নারীদের তীব্র নিন্দা জানিয়ে তাদেরকে জান্নাতহৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি জান্নাত দেখলাম। লক্ষ্য করলাম তাতে অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র। জাহান্নাম দেখলাম। লক্ষ্য করলাম, তাতে অধিকাংশ অধিবাসী নারী'।[৭৩] এরূপ বহু হাদীছ

---

৬৮. *মিশকাত হা/৪৫০৩*।

৬৯. *আবূদাঊদ হা/৪৯২৪; সনদ ছহীহ*।

৭০. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৯৯*।

৭১. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৮৯*।

৭২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪*।

৭৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৩৪*।

রয়েছে, যেগুলোতে অশালীন নারীর নিশ্চিত ক্ষতির হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

এখানে যে একটি বিষয় উল্লেখ করতেই হয়, তা হল- নারী খেল-তামাসা, উল্লাস-নৃত্য করে তার যৌবন উপভোগ করার কারণে শাস্তি পাবে। তেমনিভাবে যুবকও শাস্তি পাবে। কিন্তু যে পুরুষ পরিবারের দায়িত্বে নিয়োজিত, তিনি যদি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পড়েন, তাহাজ্জুদ পড়েন, নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত হন, মুখে দাড়ি রেখে ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে চলাফেরা করেন, সমাজেও ভদ্রজন হিসাবে পরিচিতি পান, কিন্তু তিনি পরিবারের সদস্যদেরকে উত্তমভাবে নজরদারি করেন না, এমনতরো ভদ্রজনকেও হাদীছে 'দাইয়ূস' বলা হয়েছে। দাইয়ূস হলো- যে ব্যক্তি তার পরিবারকে বেহায়াপনার সুযোগ দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِيْ يُقِرُّ فِي أَهْلِه الْخَبَثَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তিন ব্যক্তির উপরে জান্নাত হারাম করেছেন; মদ্যপায়ী, পিতামাতার অবাধ্য ও দায়ূছ। যে তার পরিবারে অশ্লীলতাকে স্বীকৃতি দেয়'।[৭৪] দাইয়ূসী এমন একটি পাপ- যাতে নিজে পাপ করার প্রয়োজন হয় না, অন্যের পাপ দেখে নিরব থাকলেই পাপ অর্জিত হয়। তবে কোন ব্যক্তি যদি পরিবারকে যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন, তাতে তার কোন পাপ নেই। আল্লাহ বলেন, لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

অন্যান্য কার্যক্রম :

এছাড়াও বৈশাখে আলপনা অংকন, বৈশাখী-পোষাক পরিধান, পান্তা-ইলিশ ভোজ প্রভৃতিতে বিনোদনের নামে লক্ষ লক্ষ্য টাকা ব্যয় হয়। 'আলপনায় বৈশাখ-১৪২১' শিরোনামে এবার জাতীয় সংসদের বিপরীতে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে ১৩ এপ্রিল রাত থেকে ১৪ এপ্রিল ভোর পর্যন্ত আঁকা হয় দীর্ঘ আলপনা। অথচ অপচয়ের এই টাকা যদি অন্নহীন বনু আদমের দু'মুঠো ভাতের জন্য ব্যয় করা হ'ত তাহ'লে উভয়ই কত উপকৃত হ'ত! অথবা অন্য কোন কল্যাণকর কাজে ব্যয়িত হলে তা পরকালের পাথেয় হ'ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই দান কবরের শাস্তিকে নিভিয়ে দেয় এবং মুমিন কিয়ামতের দিন তার দানের ছায়াতলে ছায়া গ্রহণ করবে'।[৭৫] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِيْنِه وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِى كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُوْنَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ وَيُرَبِّيْهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيْلَهُ.

'যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করে, আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত গ্রহণ করেন না। আল্লাহ উহা ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর দানকারীর জন্য এটা লালন-পালন করতে থাকেন যেমনভাবে তোমাদের কেউ ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন-পালন কর। অবশেষে উহা পাহাড় পরিমাণ হয়ে যায়।[৭৬]

আমাদের আহ্বান :

মুমিন হৃদয়! কল্পনা করুন, নতুন বছরের কি মূল্য থাকবে যদি প্রাণপক্ষী পিঞ্জর ভেঙ্গে বেরিয়ে যায় পুরাতন বছরে? শুভকামনায় প্রতিটি নববর্ষ উদযাপন করে পুরাতন বছর থেকে নতুন বছর কিছুটা এগিয়েছে কি? তবে কি স্বার্থকতা রয়েছে এই উদযাপনে? সুতরাং আমাদের আহ্বান-

আল্লাহ জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করার জন্য, কে সবচেয়ে বেশী সুন্দর আমল করতে পারে *(মুলক ২)*। আসুন, আমরা আমলনামা সমৃদ্ধকরণের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই।

যে উৎসব পৌত্তলিক-খৃষ্টান সমাজ গ্রহণ করেছে তাকে কেন আমরা বর্জন করছি না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুসরণ করল, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হল'।[৭৭]

প্রিয় অভিভাবক! আপনার স্নেহের সন্তানকে যে বয়সে আপনি রশি ছেড়ে রেখেছেন বর্ষবরণ অনুষ্ঠান পালন করতে, সে বয়সে মুস'আব বিন উমাইর (রাঃ) গিয়েছেন ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হতে।

তরুণ-তরুণী ভাইবোন! নিজেকে অবমূল্যায়ন করো না। তোমার মত যুবকের হাতে ইসলাম শক্তিশালী হয়েছে। তোমার মত তরুণীরা কত পুরুষকে দ্বীনের পথে অবিচল থাকতে সাহস জুগিয়েছে।

আরেকটি আবেদন রাখতে চাই- অভিভাবক মহলে, আপনার সচেতনতার অভাবে যদি আপনার সন্তান নষ্ট হয় তবে আপনি ব্যর্থ অভিভাবক। জেনে রাখুন! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[৭৮] সুতরাং আসুন! সেদিন আসার আগেই আমরা সচেতন হই, যেদিন আমার সন্তান আমার জান্নাতের গতিরোধ করবে।

সমাপনী :

পরিশেষে বলব, বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ইসলামী শরী'আতের সাথে সাংঘর্ষিক একটি অনুষ্ঠান। অথচ মুমিন জীবন এলাহী বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে পালনীয় ছিল না, এমন কিছু এ যুগেও পালনীয় হ'তে পারে না। কাজ করার আগেই জবাবদিহিতার চিন্তা করতে হবে। যদি ভুল করে ফেলে, তবে সে তওবা করবে। বর্ষবরণের এই অপসংস্কৃতির থাবায় পড়ে কত তরুণ-তরুণী যে জীবনের সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে, তা দেখার কেউ নেই। সচেতন মুমিনদের উচিত বর্ষবরণের মতো এমন বেলেল্লাপূর্ণ এবং অর্থ ও সময়ের অপচয় সর্বস্ব অনুষ্ঠান হতে বিরত থাকা এবং সর্বস্তরের মুসলমানদের এই অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!!

---

৭৪. *ছহীহুল জামে' হা/৩০৫২।*
৭৫. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪৮৪।*
৭৬. *মুসলিম হা/১০১৪; তিরমিযী হা/৬৬১; ইবনু মাজাহ হা/১৮৪২।*
৭৭. *আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭, সনদ হাসান।*
৭৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫।*

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (হাদীছ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে হাদীছ বলে।

২. হাদীছ দু'প্রকার। যথা- (১) মাকবূল (গ্রহণযোগ্য) (২) মারদূদ (প্রত্যাখ্যাত)।

৩. মাকবূল হাদীছ দু'প্রকার। যথা- ছহীহ ও হাসান।

৪. দু'প্রকার। যথা- যঈফ (দুর্বল) ও জাল (বানোয়াট)।

৫. যে হাদীছ নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। যার সনদ পরস্পর সম্পৃক্ত, তার মধ্যে গোপন ত্রুটি এবং তা শাযও (অন্য কোন অধিকতর নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনার বিরোধী) নয়, তাকে ছহীহ হাদীছ বলে।

৬. যে হাদীছ নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা, কাজ বা সমর্থন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে মারফূ হাদীছ বলে।

৭. যে কথাটি মানুষ তৈরী করেছে, অতঃপর তা নবী করীম (ছাঃ)-এর নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে জাল হাদীছ বলে।

৮. প্রসিদ্ধ ছহীহ হাদীছ গ্রন্থ ৬টি। বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ।

৯. বুখারী ও মুসলিমকে।

১০. যে হাদীছটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তাকে 'মুত্তাফাকুন আলাইহ' বলা হয়।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (হাদীছ বিষয়ক)

১. হাদীছ গ্রন্থগুলোর মধ্যে কোন কিতাবে সবচেয়ে বেশী হাদীছ সংকলিত হয়েছে?

২. মুসনাদে আহমাদে কতটি হাদীছ রয়েছে?

৩. ছহীহ বুখারীতে কতটি হাদীছ রয়েছে?

৪. ছহীহ মুসলিমে কতটি হাদীছ রয়েছে?

৫. সুনানে আবু দাঊদে কতটি হাদীছ রয়েছে?

৬. সুনানে তিরমিযীতে কতটি হাদীছ রয়েছে?

৭. সুনানে নাসাঈতে কতটি হাদীছ রয়েছে?

৮. সুনানে ইবনে মাজাহতে কতটি হাদীছ রয়েছে?

৯. ছহীহ বুখারীর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ভাষ্যগ্রন্থের নাম কি?

১০. কুরআনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধতম গ্রন্থ কোনটি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
সুরিটোলা, ঢাকা।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১. আজব এক বস্তু দেখে এলাম হাটে
আট পা তার দুই হাঁটু, লেজ আছে তার পিঠে।

২. রাস্তা দিয়া দুইটি মেয়ে যাচ্ছে চলিয়া
একই দামের একই শাড়ী দুইজনে পরিয়া।
কত দামের শাড়ী এবং সম্বন্ধে কি হয়?
একথায় বল দাম, দাও পরিচয়।

৩. ভাষা আছে কথা আছে সাড়া-শব্দ নেই,
প্রাণীর সাথে থেকেও তার নিজের প্রাণ নেই।

৪. তুমি আমি একজন দেখতে একরূপ
আমি কত কথা কই তুমি কেন চুপ?

৫. জন্ম হ'তে যতক্ষণ আয়ু হবে তার
মৃত্যুর ততক্ষণ পরে হাসে সে আবার।

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
সুরিটোলা, ঢাকা।

আল্লাহ্র দান

আলী হোসাইন ছাদ্দাম
দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

এই সবুজ শ্যামল
সোনালী ফসল,
সাগর, পাহাড় ও নদী
জীব-জন্তু পশু-পাখি,
নীলাকাশ চাঁদ-সুরুয
স্নিগ্ধ আলো জোছনা
সব তোমারই দান,
ওগো রহীম রহমান!

ভালো অভ্যাস

তাসনীম আব্দুল্লাহ ফুওয়াদ
৪র্থ শ্রেণী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সবচেয়ে সেরা নাম হ'ল আল্লাহ
আমরা তাকে ডাকি।
সবচেয়ে সেরা নেতা হ'লেন মুহাম্মাদ
আমরা তাঁকে অনুকরণ করি।
সবচেয়ে সেরা ধর্ম হ'ল ইসলাম
আমরা তা মেনে চলি।
সবচেয়ে সেরা গ্রন্থ হ'ল আল-কুরআন
আমরা তা অর্থসহ পড়ি।
সবচেয়ে সেরা ব্যাখ্যা গ্রন্থ হ'ল হাদীছ
আমরা তা চর্চা করি।
সবচেয়ে সেরা গান হ'ল আযান
আমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনি।
সবচেয়ে সেরা অভ্যাস হ'ল ছালাত
আমরা তা সময় মত আদায় করি।
এগুলোই হ'ল সফলতার গ্যারান্টি।

***

স্বদেশ

নীরব ঘাতক হাড়ক্ষয় রোগ : আক্রান্ত দেশের ৪ কোটি ৮০ লাখ মানুষ

দেশে প্রতি দশজন মানুষের মধ্যে তিনজন তথা ৪ কোটি ৮০ লাখ নীরব ঘাতক অস্টিওপোরেসিসি (হাড়ক্ষয়) রোগে আক্রান্ত। বিশ্বে আনুমানিক ২০ কোটি মানুষ এ রোগে আক্রান্ত এবং প্রতি ৩ সেকেন্ডে একজন করে মানুষ এ রোগে নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছেন। সারা বিশ্বে প্রতি তিনজন নারীর একজন এবং প্রতি পাঁচজন পুরুষের একজন বর্তমানে হাড়ক্ষয় রোগে ভুগছেন। একবার এ রোগে আক্রান্ত হ'লে তা আর নিরাময় হয় না।

গত ১৮ অক্টোবর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ রিউমাটোলজি সোসাইটি'র এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে সোসাইটির মহাসচিব অধ্যাপক নযরুল ইসলাম বলেন, হাড়ক্ষয় রোগ অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রক্রিয়া। ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়ামের অভাবে সাধারণত এ রোগ হয়। ২১ থেকে ৩৯ বছর বয়সের মধ্যেই পূর্ণ হাড় তৈরী হ'তে হবে। অর্থাৎ ঐ বয়সে যার হাড় যত শক্ত হবে, বয়সকালে তার হাড়ক্ষয় রোগ এবং হাড়ভাঙার ঝুঁকি তত কম হবে। তিনি বলেন, নিয়মিত ব্যায়াম, হাঁটাহাঁটি, গায়ে রোদ লাগানো (সকাল ১০-টা থেকে বিকাল ৪-টা পর্যন্ত কমপক্ষে ১০ মিনিট), ধূমপান ত্যাগ, শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, ধূমপানের কারণে হাড়ক্ষয় সবচেয়ে বেশী হয়।

নীরব ঘাতক এই রোগে একবার আক্রান্ত হ'লে তা আর পুরোপুরি নিরাময় হয় না। তবে ওষুধ সেবন, ব্যায়াম করা, ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম সেবনের মাধ্যমে হাড়ের ঘনত্ব বাড়ানো যায়। যা রোগের ভয়াবহতা থেকে রোগীকে রক্ষা করে। হাড়ক্ষয় রোগের কারণে অল্প আঘাতে শরীরের হাড় ভেঙে যায়। অনেক সময় কোমরের হাড় ভেঙে বা বেঁকে যাওয়ার ফলে শরীরের নিচের অংশ অবশ হয়ে যায়, ফুসফুস সংক্রমণ রোগ বেশি হয়। এ রোগে মৃত্যুর হার অনেক বেড়ে যায়। অধ্যাপক নযরুল ইসলাম জানান, বাংলাদেশে ১০০ জনের ওপরে পরিচালনা করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৯৭ শতাংশ মানুষের ভিটামিন ডি-এর অভাব রয়েছে। মাত্র তিনজনের শরীরে পরিমিত ভিটামিন ডি আছে।

অধ্যাপক গোলাম আযমের মৃত্যু

'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'-এর সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম গত ২৩শে অক্টোবর রোজ বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ১০ মিনিটে ঢাকার বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের প্রিজন সেলে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে ৯২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।* দীর্ঘ দিন থেকে তিনি নানা ধরনের অসুখে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৬ ছেলে ও ২০ জন নাতি-নাতনী রেখে গেছেন। তাঁর কোন কন্যাসন্তান নেই। ছয় ছেলের সকলেই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। যাদের পাঁচজন বিদেশে এবং একজন দেশে থাকেন। তাঁর ২০ জন নাতি-নাতনীর অধিকাংশ লণ্ডনের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছেন।

শনিবার জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে তাঁর জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন তাঁর চতুর্থ পুত্র সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহ আমান আল-আযমী। হাযার হাযার নেতাকর্মী ও সাধারণ মুছল্লী তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর বড় মগবাজারে স্বীয় পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী : অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯২২ সালে ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে স্বীয় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন মাওলানা গোলাম কবীর এবং পৈত্রিক বাড়ী ছিল ব্রাহ্মণবাড়ীয়া যেলার নবীনগর উপযেলার বীরগাঁও গ্রামে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম,এ পাস করেন। ১৯৪৯ সালে ঢাবি ছাত্র সংসদ বা ডাকসু-র জিএস ছিলেন। সে সময় ঢাকা সফররত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নিকট বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ছাত্রদের পক্ষ হ'তে স্মারক লিপি প্রদান করেন। তৎকালীন মুসলিম লীগের বিশিষ্ট নেতা আবুল হাশেম-এর পুত্র বর্তমানে বিশিষ্ট বাম রাজনীতিক বদরুদ্দীন ওমর *(জন্ম ১৯৩১ খৃঃ)* বলেন, হিন্দু কোন ছাত্রকে দিয়ে স্মারকলিপি পেশ করা হ'লে তার ভিন্ন ব্যাখ্যা হ'তে পারে বিধায় ডাকসু'র ভিপি অরবিন্দ বোসকে বাদ দিয়ে জিএস গোলাম আযমকে দিয়ে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছিল'।

১৯৫১ সালে তিনি নওগাঁ সরকারী কলেজের আরবীর অধ্যাপক মাওলানা মীর আব্দুস সালামের দ্বিতীয়া কন্যা আফীফা খাতুনকে বিবাহ করেন। যিনি ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস-এর সাবেক সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারীর আপন মামাতো বোন।

তিনি ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে রংপুর সরকারী কারমাইকেল কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। তখন তিনি তাবলীগ জামাতের সাথে যুক্ত ছিলেন। পরে ১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীর সংস্পর্শে আসেন এবং ১৯৫৫ সালে চাকুরী ছেড়ে সরাসরি জামায়াতের রাজনীতিতে নেমে পড়েন। সেসময় জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা আমীর ছিলেন মাওলানা আব্দুর রহীম। স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৭১-এর ২২শে নভেম্বর তিনি পাকিস্তানে চলে যান। অতঃপর ১৯৭৮ সালে অসুস্থ মাকে দেখার জন্য ঢাকায় ফিরে আসেন। আর পাকিস্তানে ফিরে যাননি। ১৯৯১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তিনি জামায়াতের 'আমীর' হন। পরে 'নাগরিকত্বহীন একজন ব্যক্তি কোন রাজনৈতিক দলের প্রধান হতে পারেন না' বিধায় তার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন হয়। ফলে ৯২ সালের মার্চে তিনি গ্রেফতার হয়ে ১৬ মাস কারাগারে থাকেন। অতঃপর ১৯৯৪ সালে নাগরিকত্ব ফিরে পান। এভাবে কয়েক দশক ধরে গোপনে ও প্রকাশ্যে জামায়াতের আমীরের দায়িত্ব পালন শেষে ২০০০ সালে অবসরে যান।

২০১২ সালের ১১ জানুয়ারী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আদেশে অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। অতঃপর তাঁর বিচার শুরু হয় এবং ৯০ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। অসুস্থতার কারণে শুরু থেকেই তাকে 'বিএসএমএমইউ'-এর প্রিজন সেলে রাখা হয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

এখন তোর আল্লাহ কোথায়?

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী বলেছেন, আমার কাছে 'নারী-পুরুষের পর্দা' নামক একটি বই ছিল। বইটি দেখে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আমাকে সভাপতির রুমে ডেকে নিয়ে বলে, তোর কাছে ইসলামী বই আছে, তুই তো জঙ্গী, এখন তোর আল্লাহ কোথায়? তোকে বাঁচালে আমরা বাঁচাবো, তা ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না'। ছাত্রীটি অভিযোগ করে বলেন, এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বা হলের প্রক্টর কেউই আমার কোনো কথাই শোনেননি, তারা ছাত্রলীগ নেতাদের কথা মতোই কাজ করেছেন। এই হ'ল বর্তমান প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত ৯০% মুসলিমের দেশে অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা।

সুপ্রীম কোর্টের জনৈক আইনজীবী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন ধর্মবিদ্বেষী নানা চক্রের দাপটে অস্থির। দুনিয়ার এমন কোন অন্যায়, দুর্নীতি-পাপাচার নেই যা এখানে সংঘটিত হয় না। যেখানে অপসংস্কৃতি, ধর্মদ্রোহিতা, যেনা-ব্যভিচার, মাদক ব্যবহারের ছড়াছড়ি সেখানে কিন্তু যত বাধা সব কেবল ইসলামের বেলায়। *[মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন (স.স.)]*

Contents

বিদেশ

বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব আমাদের জাদুতে বিশ্বাস করতে শেখায়। অতএব বিগ ব্যাং-ই সঠিক সৃষ্টিতত্ত্ব

-পোপ ফ্রান্সিস

গত ২৮ শে অক্টোবর বিজ্ঞান বিষয়ক এক সমাবেশে এই উক্তি করেন খ্রিস্টধর্মের সর্বোচ্চ পদাধিকারী পোপ ফ্রান্সিস। তিনি বলেন, ঈশ্বর তো কোন জাদুকর নন যে, জাদু-কাঠির ছোঁয়ায় সবকিছু করে ফেলবেন! বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব আমাদের জাদুতে বিশ্বাস করতে শেখায়। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। বরং বিগ ব্যাং-ই সঠিক সৃষ্টিতত্ত্ব। আর ঈশ্বর চেতনার সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই।

তিনি বলেন, 'বিজ্ঞান-তত্ত্বের সঙ্গে ধর্মের কোন বিরোধ নেই। মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব হিসাবে আমরা বিগ ব্যাং-কেই মেনে নিয়েছি। ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্তা, এই কথা বললেও সৃষ্টির স্বরূপ বুঝতে বিগ ব্যাংয়ের মতো তত্ত্বের প্রয়োজন রয়েছে। জেনেসিসে যেভাবে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা পড়লে মনে হয়, ঈশ্বর স্রেফ এক জাদুকর এবং তার জাদু-কাঠির ছোঁয়ায় সব কিছু সৃষ্টি করে ফেলেছেন! পোপের এই মন্তব্য নিয়ে কট্টরপন্থী খ্রিষ্টানদের মধ্যে সমালোচনার ঝড় উঠলেও বিজ্ঞানীরা তার এই মন্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছেন।

[কেবল বিস্ফোরণেই কিছু সৃষ্টি হয় না। বরং এর জন্য সৃষ্টিকর্তা প্রয়োজন হয়। যিনি জীবজগত ও তাদের বাসোপযোগী করে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেন। অতএব কেবল বিগ ব্যাং-ই শেষ কথা নয়। আল্লাহ বলেন, 'অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল একত্রিত ছিল। অতঃপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং আমরা পানি দ্বারা সকল প্রাণবান বস্তুকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?' (আম্বিয়া ৩০)।]

বিশ্বে যেকোন সময় পরমাণু যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার আশঙ্কা

-নোয়াম চমস্কি

বিশ্বে যেকোন সময় পরমাণু যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক নোয়াম চমস্কি। তিনি বলেছেন, বিশ্ব এর আগে কখনোই বিপজ্জনকভাবে পরমাণু যুদ্ধের এতো নিকটে চলে আসেনি। রাশিয়া এবং পশ্চিমা দেশগুলো আরেকটি শীতল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় বিশ্বে এ যুদ্ধ যেকোন সময়ে বেঁধে যেতে পারে। চমস্কি বলেন, ন্যাটো যে লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা বদলে গেছে এবং ন্যাটো এখন বিশ্বের জ্বালানি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ দখল করতে চাচ্ছে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, এর আগে বিশ্ব কখনোই পরমাণু যুদ্ধের এতো কাছাকাছি আসেনি এবং যারা এ যুদ্ধ শুরু করবে তারা সবাই এতে ধ্বংস হয়ে যাবে। মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জড়িয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অচলাবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে বলে জানান নোয়াম চমস্কি। ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকে 'হাতুড়ির আঘাতের' সঙ্গে তুলনা করেন তিনি।

২০১৪ সালে নোবেল বিজয়ী যারা

২০১৪ সালে ৬টি বিষয়ে মোট ১৩ জন নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। মস্তিষ্কের জিপিএস পদ্ধতির আবিষ্কারের জন্য **চিকিৎসা বিজ্ঞানে** নোবেল পুরস্কার লাভ করছেন বৃটেনের ৩ বিজ্ঞানী গবেষক প্রফেসর জন ওকেফে, মে-ব্রিট মোসার এবং অ্যাডভার্ড আই. মোসার। জ্বালানী সাশ্রয়ী উজ্জ্বল আলো তৈরীতে সক্ষম নীল লাইট এমিটিং ডায়োড (এলইডি) উদ্ভাবনের জন্য **পদার্থ বিজ্ঞানে** নোবেল পেয়েছেন ৩ জাপানী বিজ্ঞানী ইসামু আকাশাকী, হিরোশি আমানো ও সুজি নাকামুরা। প্রচলিত অপটিক্যাল মাইক্রোস্কপির অতি তড়িৎ চম্বুকীয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে ন্যানোকপিতে পরিণত করার জন্য **রসায়নে** নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যৌথভাবে ৩ জন। তারা হ'লেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এরিক বেটজিগ ও উইলিয়াম ই. মোয়েনার এবং জার্মানির স্টিফান ডব্লিউ হেল। **সাহিত্যে** নোবেল পেয়েছেন ফ্রান্সের লেখক প্যাত্রিক মোদিয়ানো। মার্কেট পাওয়ার এন্ড রেগুলেশন বিশ্লেষণের জন্য **অর্থনীতিতে** নোবেল পেয়েছেন ফ্রান্সের নাগরিক জ্যঁ তিরোল। **শান্তিতে** নোবেল পেয়েছেন পশ্চিমাদের প্রচারণায় হঠাৎ শান্তির প্রতীক বনে যাওয়া পাকিস্তানের তরুণী মালালা ইউসুফযাই এবং ভারতের শিশু অধিকার বিষয়ক কর্মী কৈলাশ সত্যার্থী। মাত্র ১৭ বছর বয়সে নোবেল জয়ের ঘটনা বিশ্বে এটাই প্রথম।

আইএস বিরোধী যুদ্ধের ঘনঘটায় যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ব্যবসা জমজমাট

আইএস বিরোধী যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বড় ধরনের অস্ত্র ব্যবসা শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। নিরাপত্তার অজুহাতে এসব অস্ত্র কিনছে আরব দেশগুলো। যুক্তরাষ্ট্র সঊদী আরবের কাছে ১৭৫ কোটি ডলার সমমূল্যের প্যাট্রিয়ট মিসাইল ব্যাটারী বিক্রির পরিকল্পনা করছে। আর সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে প্রায় ৯০ কোটি ডলার সমমূল্যের দূরপাল্লার আর্টিলারী বিক্রি করছে। এদিকে কুয়েত এবং কাতার ইতিমধ্যে পিএসি-৩ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ক্রয় করেছে। গ্রাউন্ড রাডার ব্যবহার করে এটি ব্যালাস্টিক মিসাইল, শত্রু বিমান এবং ক্রুজ মিসাইল ধ্বংস করতে সক্ষম। উপসাগরীয় দেশগুলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, রাডার সিস্টেম এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারে ব্যাপক অর্থ ব্যয় করছে। এসব অস্ত্রের সিংহভাগই আসছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

[বিগত যুগে মদীনার সূদী কারবারী ইহূদীরা আউস ও খাযরাজদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে যেভাবে অস্ত্রব্যবসা চালিয়ে যেত, আজও তারা ও তাদের দোসররা সেটাই করে যাচ্ছে। অথচ বোকা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানরা তাদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদেরকে নিঃস্ব ও পরমুখাপেক্ষী করছে। অতএব সংশ্লিষ্টরা সাবধান হউন এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন (স.স.)।]

পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব চাই

-ঢাকায় এ পি জে আব্দুল কালাম

বিশ্বখ্যাত মহাকাশ বিজ্ঞানী, ভারতের পরমাণু বোমার জনক ও সে দেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম বলেছেন, পারমাণবিক শক্তি যখন মানবসভ্যতা ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন তা অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়। তাই পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় ভারত, পাকিস্তানসহ সব দেশের একসঙ্গে কাজ করা উচিত। গত ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের ১১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকায় এসে হোটেল সোনারগাঁও-য়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় পারমাণবিক শক্তির নেতিবাচক দিক সম্পর্কে এ অভিমত দেন সাবেক এই রাষ্ট্রপতি।

ঘণ্টা দেড়েকের মতবিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'আমার মনে হয়েছে, পারমাণবিক শক্তি তখন অমঙ্গলের হয়, যখন তা মানব উন্নয়নের ক্ষেত্র ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা হয়। আমি বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের হাসি দেখতে চাই, কান্না নয়। আমি মনে করি, যেসব দেশের পরমাণু অস্ত্র রয়েছে তাদের জন্য নিরস্ত্রীকরণের সময় এসেছে।

মুসলিম জাহান

পবিত্র কা'বা গৃহের চাবি রক্ষকের মৃত্যু

কা'বা শরীফের চাবি রক্ষক (জ্যেষ্ঠ পরিচালক) শেখ আবদুল কাদের বিন ত্বহা আল-শাইবী (৭৫) মারা গিয়েছেন। *ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন*। বৃহস্পতিবার জেদ্দার কিং খালেদ ন্যাশনাল গার্ড হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কা'বা শরীফে জানাযার পর তাঁকে মক্কার আল-মো'আল্লা কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় লাখ লাখ হাজী, পবিত্র দুই মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাগণ এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজন যোগ দেন। চার বছর আগে তার চাচা আব্দুল আযীয আল-শাইবীর মৃত্যুর পর কা'বা শরীফের জ্যেষ্ঠ পরিচালক হন তিনি। এখন শাইবী পরিবারের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি ড. ছালেহ বিন ত্বহা আল-শাইবী হবেন কা'বার নতুন পরিচালক। শাইবী পরিবার ঐতিহ্যগতভাবে কা'বা শরীফের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারার সম্মান পেয়ে আসছে। কা'বা শরীফ খোলা, বন্ধ করা এবং এর পরিষ্কার করার কাজও তারা করে আসছেন। শেখ আবদুল কাদের আল-শাইবী ছিলেন ছাহাবী ওছমান বিন তালহা (রাঃ)-এর ১০৮তম উত্তরাধিকারী। যাঁর হাতে রাসূল (ছাঃ) উক্ত দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন।

দুবাই হওয়ার স্বপ্ন চুরমার
সোমালিয়ার মতো ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে লিবিয়া!

আরব বসন্তের সূত্র ধরে ২০১১ সালে বিপ্লবের মাধ্যমে লিবিয়ায় দীর্ঘদিনের শাসক মু'আম্মার গাদ্দাফীর শাসনের পতন ঘটে। নির্মমভাবে নিহত হন তিনি। দুবাইয়ের ন্যায় প্রাচুর্যপূর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন লিবিয়ার জনগণ। কিন্তু গাদ্দাফী-পরবর্তী তিনটি বছর পার হয়ে গেলেও তাদের সেই স্বপ্ন এখন ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছে। দেশটিতে মারাত্মক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, অস্ত্রের ঝনঝনানি এবং মিলিশিয়াদের অনুকম্পার ওপর নির্ভর করে সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। গত তিন বছরের রক্তক্ষয়ী সংঘাত এতই ভয়াবহ যে এসময় বিপ্লবকালীন সংঘর্ষের মতো কয়েক হাযার লোক নিহত হয়েছে। উত্তর আফ্রিকার তেলসমৃদ্ধ দেশ লিবিয়া এখন সমৃদ্ধ দুবাই নয়, বরং সোমালিয়ার মতো ব্যর্থ রাষ্ট্রের পরিণতি বরণ করতে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা করছেন দেশটির জনগণ।

লিবিয়ায় এখন দুই সরকারের শাসন চলছে। একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সেক্যুলারপন্থীদের সরকার। অন্যটি ইসলামপন্থীদের জোটের স্বঘোষিত সরকার। দুই সরকার সহ বিভিন্ন মিলিশিয়া গ্রুপের মাঝে সংঘাত এখন নিত্যদিনের ঘটনা। বিপ্লবকালীন যোদ্ধা ৩৯ বছর বয়স্ক শিক্ষক মুহাম্মাদ আল-কারগালি বলেন, 'আমাদের যে বিপুল তেলসম্পদ রয়েছে, তা দিয়ে অনায়াসে আমরা দেশটিকে দুবাইয়ে পরিণত করতে পারতাম। কিন্তু এখন আমরা লিবিয়াকে আরেকটি সোমালিয়া বা ইরাকে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা করছি। বর্তমানে অধিকাংশ লিবীয় গাদ্দাফী শাসনামলের স্থিতিশীল দিনগুলো ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।

বেনগাজির ডাক্তার ছালেহ মাহমূদ আল-আকূরী বলেন, বর্তমানে আঞ্চলিক, আদর্শিক এবং গোত্রীয় সংঘাত একনায়কতান্ত্রিক শাসনের চেয়েও বহুগুণে খারাপ। তাই গাদ্দাফিকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও অনেক লিবীয় পুরনো শাসন ফিরে পেতে চাচ্ছেন।

তেল উৎপাদনকারী দেশটির অবকাঠামো দিন দিন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে। তাই অর্থনীতি পুনরুজ্জীবন, সমৃদ্ধি অর্জন ও উন্নত জীবনের আশা এবং শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উত্তরণের আকাংখা মরুভূমির বালুর নিচে দিন দিন চাপা পড়ে যাচ্ছে। দেশটির পরিচয় ধীরে ধীরে কালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মোবাইলের ব্যাটারী ব্যবহার করা যাবে ২০ বছর!

মোবাইল ও ট্যাবে টানা ২০ বছর ব্যবহার করা যাবে এবং দ্রুত চার্জ হবে, এমন একটি লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারী উদ্ভাবন করেছেন গবেষকরা। সিঙ্গাপুরের ন্যানইয়াং টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির গবেষকদের তৈরী করা নতুন এই লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারী প্রথম দুই মিনিটেই ৭০% পর্যন্ত চার্জ হবে এবং ফুল চার্জ হ'তে সময় নেবে মাত্র ২০ মিনিট। আর ব্যাটারিটি ব্যবহার করা যাবে টানা ২০ বছর পর্যন্ত। স্মার্টফোন ও ট্যাবে ব্যবহৃত বর্তমান লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারীর রিচার্জ সাইকেল সাধারণত ৫০০। নতুন উদ্ভাবিত এই ব্যাটারির রিচার্জ সাইকেল ১০,০০০।

গবেষকরা জানিয়েছেন, নতুন লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারীতে টাইটেনিয়াম ডাই অক্সাইড জেল ব্যবহৃত হয়েছে, যা ব্যাটারিতে দ্রুত রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। ফলে দ্রুত চার্জ হওয়ার পাশাপাশি সর্বাধিক ব্যাটারী লাইফের নিশ্চয়তা দেবে। তবে এটি বাজারজাত হ'তে এখনো দেরী আছে।

ডুবে যাওয়া নৌযানের লোকেশন ডিটেক্টর আবিষ্কার

পানির নিচে ডুবে যাওয়া নৌযানের খোঁজ জানতে লোকেশন ডিটেক্টর আবিষ্কার করেছেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ফারূক বিন হোসাইন ইয়ামীন। তিনি জানান, নৌযানের সামনে ও পিছনের অংশে লাগানো থাকবে কম্পন সৃষ্টিকারী দু'টি ডিভাইস। পানি নিরোধক কৃত্রিম বিদ্যুৎ কোষ দিয়ে চলবে এসব ডিভাইস। ডুবে যাওয়া নৌযান থেকে ডিভাইসগুলো কম্পন সৃষ্টি করতে থাকবে ডুবে যাওয়ার পরবর্তী সাতদিন পর্যন্ত। এর মধ্যে উদ্ধার কর্মীরা পানির উপরিভাগ থেকে হাইড্রোসোনার মেশিনের সাহায্যে ভাইব্রেটর থেকে সৃষ্ট কম্পনকে শনাক্ত করে নৌযানের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে। এ ডিভাইসটি নদীর মোহনা কিংবা যেকোন প্রতিকূল পরিবেশেও কাজ করতে সক্ষম।

লোকেশন ডিটেক্টরের আরেকটি ধরন রয়েছে, যা স্বল্প গভীর নদীতে ডুবে যাওয়া নৌযানের অবস্থান শনাক্ত ও নৌযানে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে পারবে। ডিভাইসটিতে বার্তা গ্রহণ ও প্রেরণে সক্ষম ইলেকট্রিক চিফ বসানো থাকবে। নৌযানটি ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকেশন ডিটেক্টর ডিভাইসটি ভেসে উঠবে। আর তৎক্ষণাৎ ডিভাইসটি শব্দসহ সিগন্যাল দিতে থাকবে। পুরো ডিভাইসটি ব্যাটারি এবং ক্ষুদ্র সোলার প্যানেলের সাহায্যে চলবে। এছাড়া এতে লাইটের বিকল্প হিসাবে রেডিয়ামে মোড়ানো থাকবে। এর সঙ্গে অতি গুরুত্বপূর্ণ লোড ডিটেক্টর নামে আরেকটি ডিভাইস যুক্ত থাকবে, যার মাধ্যমে নৌযানে প্রবেশের পথে বড় মনিটরে যাত্রীরা যানের পানির উচ্চতা ও যাত্রী ধারণক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা পাবে এবং সবুজ, হলুদ ও লাল বাতির সিগন্যাল দেখে নৌযানে আরোহনের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

যন্ত্রটির উদ্ভাবক জানান, দেশে প্রচলিত পদ্ধতিতে ডুবে যাওয়া নৌযানের অবস্থান জানা যায় না। কিন্তু এই যন্ত্রটির মাধ্যমে সহজে অল্প সময়ে, দ্রুততার সাথে এমনকি ঘোলাপানিতেও যে কোন গভীরতা থেকে নৌযানের অবস্থান নির্ণয় করা যাবে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৩০শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স নওদাপাড়ার পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ২য় তলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পূর্ব ও পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আইয়ূব হোসাইন।

মোহনপুর, রাজশাহী ৭ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন ধুরইল ডি.এস. কামিল মাদরাসা মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে দিন ব্যাপী এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও ধুরইল ডি.এস. কামিল মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা দুর্রুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

উপযেলা সম্মেলন

আত্রাই, নওগাঁ ৮ নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আত্রাই উপযেলার উদ্যোগে স্থানীয় মোল্লা আজাদ মেমোরিয়াল ডিগ্রী কলেজ মাঠে উপযেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চৌধুরী গোলাম মোছতফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করেন মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, ঢাকার খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল আল-মাদানী, মান্দা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আফযাল হোসাইন, দামনাশ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব নিযামুল হক প্রমুখ।

যুবসংঘ

এলাকা সম্মেলন

হাট গাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ২৫ অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ আছর হাট গাঙ্গোপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে এলাকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

সুধী সমাবেশ

দুপচাঁচিয়া, বগুড়া ২৯শে অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার দুপচাচিয়া উপযেলা অডিটরিয়ামে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দুপচাঁচিয়া উপযেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও সাবেক সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রাযযাক প্রমুখ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার উদ্বোধন

ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ১৪ই সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন ধুরইল বাজারে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' উদ্বোধন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি (বর্তমানে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক) মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম, উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ এমদাদুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা ময়েযুদ্দীন, ধুরইল এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল বারী প্রমুখ। উল্লেখ্য, পাঠাগারটি প্রতিদিন বাদ আছর হ'তে এশা পর্যন্ত খোলা থাকবে ইনশাআল্লাহ।

মিথ্যা মামলায় আব্দুল মালেক গ্রেফতার

গত ২১শে সেপ্টেম্বর রবিবার দিবাগত গভীর রাতে সাতক্ষীরা পৌরসভার বাটকেখালী গ্রামের নিজ বাড়ী থেকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সদর উপযেলার অর্থ সম্পাদক জনাব আব্দুল মালেককে সন্দেহভাজন হিসাবে গ্রেফতার করেছে সাতক্ষীরা পুলিশ। অতঃপর তাকে একাধিক মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে তিনি সাতক্ষীরা যেলা কারাগারে অন্তরীণ আছেন।

[আমরা তাকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অনতিবিলম্বে নিঃশর্তভাবে মুক্তিদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।- কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল]

মিথ্যা মামলায় মুযাফফর বিন মুহসিন গ্রেফতার

গত ৭ই নভেম্বর শুক্রবার বেলা আড়াইটায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন ঢাকার মুহাম্মাদপুর আল-আমীন জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা দেওয়ার পর ছালাত শেষ বের হ'লে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) দু'জন কর্মকর্তা জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে আপোষে তাকে ডেকে নিয়ে যায়। অতঃপর ২ দিন ডিবি কার্যালয়ে আটকে রেখে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তদের হাতে সম্প্রতি নিহত 'চ্যানেল আই'-এর উপস্থাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারূকী হত্যা মামলায় সন্দেহভাজন আসামী হিসাবে গ্রেফতার দেখায়। অতঃপর কতিপয় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া তাকে ন্যাক্কারজনকভাবে কথিত জঙ্গী সংগঠন 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের' সদস্য বলে ফলাও করে অপপ্রচার চালায়। ৯ই নভেম্বর রবিবার ঢাকার সিএমএম কোর্টে সোপর্দ করে পুলিশের পক্ষ থেকে ৫ দিনের রিমাণ্ড আবেদন করলে আদালত দু'দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। অতঃপর রিমাণ্ড শেষে গত ১২ই নভেম্বর বুধবার তার জন্য যামিনের আবেদন করা হ'লে এবং পুলিশ কর্তৃক পুনরায় ৫ দিনের রিমাণ্ড আবেদন করে। আদালত যামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয় এবং কারা ফটকে তিনদিন জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেয়। বর্তমানে তিনি গাজীপুরস্থ কাশিমপুর-১ কারাগারে অন্তরীণ রয়েছেন।

অনতিবিলম্বে মুযাফফর বিন মুহসিনকে মুক্তি দিন!

-বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

গত ৯ই নভেম্বর রবিবার নূরুল ইসলাম ফারূকী হত্যা মামলায় সন্দেহজনকভাবে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনকে গ্রেফতারের নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে তার মুক্তি দাবী করেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র বর্তমান কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও সাধারণ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম। এক যুক্ত বিবৃতিতে তারা বলেন, মুযাফফর বিন মুহসিনকে কথিত জঙ্গী সংগঠন 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের' সাথে জড়িয়ে পত্র-পত্রিকায় যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তা ডাহা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। বরং যেকোন চরমপন্থার বিরুদ্ধেই তার অবস্থান ছিল স্পষ্ট। তিনি শান্তিপ্রিয় দ্বীনি সংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র দুই দুইবারের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং বর্তমানে সংগঠনের সর্বোচ্চ স্তর 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য'। 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিমে'র সাথে তার কোনরূপ সম্পর্ক নেই। অনুরূপভাবে ফারূকী হত্যার সাথেও তার দূরতম কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাকে গত শুক্রবার বাদ জুম'আ ঢাকার মুহাম্মদপুর আল-আমীন জামে মসজিদ থেকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে ডিবি পুলিশ নিয়ে যায়। অতঃপর দু'দিন ডিবি কার্যালয়ে আটকে রেখে মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার দেখায়। তারা বর্তমান সরকারের নিকট অনতিবিলম্বে তার মুক্তি দাবী করেন।

তারা বলেন, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গুম-খুনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। দাওয়াত ও সংগঠনের মাধ্যমে আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনই এই সংগঠনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য। *(দৈনিক ইনকিলাব ১০ই নভেম্বর'১৪ এবং দৈনিক প্রথম আলো ১১ই নভেম্বর'১৪-এ প্রকাশিত)।*

মুযাফফর বিন মুহসিনের মিথ্যা মামলা তুলে নিন!

-আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

অদ্য ৯ নভেম্বর রবিবার নূরুল ইসলাম ফারূকী হত্যা মামলায় সন্দেহজনক ভাবে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনকে গ্রেফতার এবং তাকে 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিমে'র নেতা বলে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ফলাও করে অপপ্রচারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। এক প্রতিবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, মুযাফফর বিন মুহসিন 'আন্দোলন'-এর যুবসংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি। তিনি পিস টিভি বাংলা-র জনপ্রিয় আলোচক। বিগত দুই সেশন তিনি এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। কথিত জঙ্গি সংগঠন 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিমে'র সাথে তার কোনরূপ সম্পর্ক নেই। অনুরূপভাবে ফারূকী হত্যার সাথেও তার দূরতম কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সর্বদা শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে তাদের জোরালো ভূমিকা সর্বত্র স্পষ্ট। কথিত জঙ্গীবাদের সাথে যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কোনরূপ সম্পর্ক নেই তা 'আন্দোলন'-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের উপর বিগত চারদলীয় জোট সরকার আরোপিত সকল মামলা আদালতের মাধ্যমে মিথ্যা সাব্যস্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে বহুপূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে। অতএব বর্তমান সরকারের আমলে একই অভিযোগে পুনরায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র কোন কর্মীকে এভাবে দোষী সাব্যস্ত করার অন্যায় প্রচেষ্টায় আমরা বিস্মিত ও মর্মাহত। তিনি সরকারের নিকটে অনতিবিলম্বে তার নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন।

মৃত্যু সংবাদ

'আন্দোলন'-এর সঊদী আরব শাখার সাবেক সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ (৫৫) গত ২৮শে অক্টোবর মঙ্গলবার দিবাগত রাত পৌনে ৮-টায় মৃত্যুবরণ করেছেন। *(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। ইতিপূর্বে প্রায় বৎসরাধিককাল তিনি বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। অতঃপর ২৬শে অক্টোবর তিনি ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, কাকরাইল, ঢাকায় ভর্তি হন। ২৮শে অক্টোবর সকাল সাড়ে ১১-টায় সেখান থেকে তাঁকে নিজ বাসভবন গাযীপুরের কাথোরায় নিয়ে আসা হয়। ঐ দিনই রাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর সেখানে রাত সাড়ে ১০-টায় কাথোরা মুহাম্মাদিয়া বালিকা দাখিল মাদরাসা ময়দানে তার প্রথম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন তার মেঝ ছেলে আব্দুর রহমান। সেখান থেকে মাইক্রোযোগে তার লাশ নিজ গ্রাম সাতক্ষীরা যেলার কাকডাঙ্গা গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তার অছিয়ত মোতাবেক আমীরে জামা'আত পরদিন ভোর সোয়া ৫-টায় মারকায থেকে সাতক্ষীরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং বেলা দেড়টায় কাকডাঙ্গা দক্ষিণ পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন।

সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর অগণিত নেতা-কর্মী ও মুছল্লীবৃন্দ তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তাকে তার পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৮১) : যৌথ পরিবারে সকলেই বিবাহিত, সবারই সন্তান-সন্ততি রয়েছে এবং সকলে একত্রে বসবাস করে এবং একান্নভুক্ত। এক্ষণে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সকলের সম্পদ একত্রিত করে যাকাত বের করতে হবে কি?

-তাসের শেখ
বাঁশইল, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : যৌথ পরিবারের সকল সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ যদি একজনের হাতে থাকে, তবে তিনিই পুরো সম্পদের উপর যাকাত আদায় করবেন। আর যদি পৃথক থাকে, সেক্ষেত্রে প্রত্যেকে পৃথকভাবে তা আদায় করবে। কেননা যাকাতের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পৃথক মালিকানাধীন সম্পদসমূহ একত্রিত করে যাকাত দেওয়ার অনুমতি নেই *(আবুদাউদ হা/১৫৭৯-৮০, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (২/৮২) : মসজিদে ওয়াকফকৃত কুরআন বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পাঠ করা এবং পরে ফেরত দেওয়া জায়েয হবে কি?

-ফেরদৌস আহমাদ, আবদালী, কুয়েত।

উত্তর : এটি জায়েয হবে না। কারণ তা মসজিদের মুছল্লীদের জন্যই ওয়াকফ করা হয়েছে। অতএব তা মসজিদে গিয়েই পাঠ করতে হবে। তবে মসজিদের প্রয়োজনাতিরিক্ত কুরআন অন্য মসজিদে স্থানান্তর করায় কোন বাধা নেই *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ্দারব ২১/২৫০; আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/১৫)*। সুতরাং প্রত্যেক মসজিদে কুরআন, হাদীছ, তাফসীর প্রভৃতি কিতাব পাঠ, পঠন ও বিতরণের পৃথক ব্যবস্থা রাখা উচিত। যেখানে মানুষ কেবল বিতরণের জন্য কিছু কুরআন ও অন্যান্য কিতাব দান করবে।

প্রশ্ন (৩/৮৩) : যারা সঊদী আরবের সাথে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করে, তাদেরকে খারেজী বলা যাবে কি?

-শামসুযযামান, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : কেবল উক্ত আমলের কারণে তাদের খারেজী বলা যাবে না। বরং খারেজীদের অন্যান্য চরমপন্থী আক্বীদা ও আমল কারু মধ্যে পাওয়া গেলে, তাকে খারেজী বলা যায়। কিন্তু এসব মন্দ লকবে কাউকে ডাকা উচিত নয়। তাতে তার মধ্যে যিদ সৃষ্টি হবে এবং হেদায়াত লাভের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ... একে অপরকে মন্দ লকবে ডেকো না। কেউ ঈমান আনলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহের কাজ। আর যারা এ কাজ থেকে তওবা করে না, তারাই যালেম' *(হুজুরাত ৪৯/১১)*।

প্রশ্ন (৪/৮৪) : আল্লাহ্র গুণবাচক নামসমূহ দ্বারা দো'আ করার পদ্ধতি কি?

-আফযাল শরীফ, মাটিয়ানী, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : ছালাত বা ছালাতের বাইরে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে তাঁর গুণবাচক নাম সমূহ দ্বারা আহ্বান করা যাবে। যেমন হে রূযীর মালিক! আমাকে রূযী দাও! হে আরোগ্য দানকারী! আমাকে আরোগ্য দান কর। হে অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখো ইত্যাদি। এর জন্য ওযূ-ছালাত-কিবলা কিছুই শর্ত নয়। তবে ছালাত অবস্থায় দো'আ করা নিঃসন্দেহে উত্তম। এ সময় ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহ করবে। আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা রাসূল (ছাঃ) মসজিদে জনৈক ব্যক্তিকে ছালাতরত অবস্থায় দো'আ করতে দেখলেন। দো'আয় সে বলছিল, হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তুমি অধিক দাতা, তুমি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং তুমি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তখন তিনি ছাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কি জান সে কি দ্বারা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করছে? সে আল্লাহ্র বড় বড় নাম দ্বারা প্রার্থনা করছে, যা দ্বারা ডাকা হ'লে তিনি জবাব দেন, যা দ্বারা কিছু কামনা করা হ'লে তিনি দান করেন *(তিরমিযী হা/৩৫৪৪, মিশকাত হা/২২৯০)*।

প্রশ্ন (৫/৮৫) : আল্লাহ-মুহাম্মাদ পাশাপাশি লেখা আছে এরূপ মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?

-মীযান, বাটরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : আল্লাহ ও মুহাম্মাদ পাশাপাশি প্রদর্শন করা শরী'আত বিরোধী। এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আল্লাহ্র সমতুল্য বুঝায়। যা বিশুদ্ধ আক্বীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী শিরকী আক্বীদা। তবে এরূপ মসজিদে ছালাত আদায় করা যায়। এরূপ লেখার কারণে মসজিদের মুতাওয়াল্লীসহ দায়িত্বশীলগণ গুনাহগার হবেন। এমতাবস্থায় মুছল্লীকে ঐসব বস্তু থেকে দৃষ্টি নীচু রাখতে হবে, যাতে তার খুশূ'-খুযূ বিনষ্ট না হয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে বিভিন্ন মসজিদে আল্লাহ-মুহাম্মাদ ও কালেমাখচিত এবং মক্কা-মদীনার ছবি সম্বলিত নকশা ও দৃষ্টিনন্দন টাইল্স বিভিন্ন মসজিদে দেখা যায়। এগুলি শরী'আত বিরোধী কাজ। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কেননা মসজিদ অহেতুক উঁচু ও জাঁকজমকপূর্ণ করা নিষিদ্ধ *(আবুদাউদ হা/৪৪৮; মিশকাত হা/৭১৮)*।

প্রশ্ন (৬/৮৬) : 'পানির অপর নাম জীবন'- কথাটি কি কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

-তারেক আযীয, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : পানির গুরুত্ব বুঝাতে এটা বলা হয়, জীবনদাতা হিসাবে নয়। কেননা পানি দ্বারাই সকল প্রাণীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আমরা পানি দ্বারা সকল প্রাণবান বস্তুকে সৃষ্টি করেছি' *(আম্বিয়া ২১/৩০)*। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই ... বৃষ্টির মধ্যে, যা আসমান থেকে আল্লাহ বর্ষণ করেন, অতঃপর তার মাধ্যমে মৃত যমীনকে পুনর্জীবিত করেন ও

সেখানে বিস্তৃত করেন সকল প্রকারের জীবজন্তু,...' *(বাক্বারাহ ২/১৬৪)*। অতএব পানি জীবনের মাধ্যম মাত্র, জীবনদাতা নয়। যেমন ঔষধ আরোগ্যের মাধ্যম। কিন্তু আরোগ্যদাতা নয়। বরং আল্লাহই হ'লেন জীবনদাতা ও আরোগ্যদাতা।

প্রশ্ন (৭/৮৭) : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু... আহাদান ছামাদান লাম ইয়ালিদ... ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ। এ দো'আটি পাঠ করলে ৪০ লক্ষ নেকী হয়' এ বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?

-সাজু আহমাদ, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মের বর্ণনাটি জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৬১৩, ৬৩১৩)*।

প্রশ্ন (৮/৮৮) : কোন কারণ ছাড়াই নফল ছালাতগুলি বসে পড়া শরী'আতসম্মত হবে কি?

-রাইয়ান, রামপুরা, ঢাকা।

উত্তর : নফল ছালাত সুস্থ অবস্থায় বসে আদায় করা জায়েয। তবে এতে অর্ধেক নেকী হবে। আর ওযরবশতঃ হ'লে দাঁড়িয়ে ছালাতের ন্যায় পূর্ণ নেকী পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা উত্তম। যে ব্যক্তি বসে ছালাত আদায় করে, সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়কারীর অর্ধেক নেকী পাবে। আর যে ব্যক্তি শুয়ে ছালাত আদায় করে, সে বসা ব্যক্তির অর্ধেক নেকী পাবে *(বুখারী হা/১১১৫-১৬, মিশকাত হা/১২৪৯)*। অত্র হাদীছটি নফল ছালাত আদায়কারীর জন্য প্রযোজ্য *(মিরক্বাত, মির'আত উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

উল্লেখ্য যে, সুস্থ অবস্থায় ফরয ছালাত দাঁড়িয়েই আদায় করতে হবে। কেননা ক্বিয়াম ছালাতের অন্যতম রুকন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র জন্য বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। সুতরাং এমতাবস্থায় বসে আদায় করলে উক্ত ছালাত বাতিল হবে।

প্রশ্ন (৯/৮৯) : কেবল পরিদর্শনের জন্য মাযার বা শিরকী কার্যকলাপ চলে এরূপ স্থানে যাওয়া যাবে কি?

-হারূনুর রশীদ, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তর : স্রেফ উপদেশ হাছিলের জন্য এসব স্থানে গমন করা যায়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ মিথ্যারোপকারীদের পরিণতি কেমন হয়েছে'? *(আন'আম ৬/১১)*।

প্রশ্ন (১০/৯০) : চলাচলের ক্ষেত্রে বা মসজিদে অন্যের পায়ে বা দেহের কোন স্থানে পা লেগে গেলে করণীয় কি?

-ইলিয়াস মোল্লা, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তর : অন্যের দেহে পায়ের স্পর্শ লাগার বিষয়টি অসতর্কতাবশতঃ ঘটে থাকে। অতএব এজন্য তার নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়াই যথেষ্ট হবে। তবে এথেকে সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) ঐসব কর্ম থেকে বেঁচে থাকতে বলেছেন, যার জন্য পরক্ষণে ওযর পেশ করতে হয় *(দায়লামী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮৩৯, ছহীহুল জামে' হা/২৬৭১)*। উল্লেখ্য যে, জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলানো সুন্নাত *(বুখারী হা/৭২৫)*। যা পালনে নেকী রয়েছে। না করলে সুন্নাত অমান্য করার গোনাহ হবে। আল্লাহ বলেন, সফলকাম হ'ল সেইসব মুমিন যারা তাদের ছালাতের হেফাযত করে' *(মুমিনূন ২৩/৫)*।

প্রশ্ন (১১/৯১) : পাঠা ছাগল দ্বারা কুরবানী দেওয়া যাবে কি?

-শহীদুল্লাহ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : পাঠা ছাগল কুরবানী দেওয়া যায়। তবে খাসী ছাগল কুরবানী দেওয়া উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাসী কুরবানী দিয়েছিলেন। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দু'টি মোটা-তাযা সাদা-কালো শিংওয়ালা খাসী ছাগল নিয়ে আসা হ'ল। তিনি দু'টির একটি মাটিতে ফেলে দিলেন এবং বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে যবেহ করলেন *(ইবনু মাজাহ হা/৩১২২; মিশকাত হা/১৪৬১, বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/১১৩৮)*।

প্রশ্ন (১২/৯২) : ইয়াযীদী সম্প্রদায় কারা? তাদের সম্পর্কে জানতে চাই।

-আব্দুল হাফীয, চাঁদপাড়া, গাইবান্ধা

উত্তর : ইয়াযীদী একটি পথভ্রষ্ট দল। যাদের বৃহদাংশ ইরাকে এবং কিছু অংশ তুরস্ক, ইরান, সিরিয়া, জর্জিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। ১৩২ হিজরীতে উমাইয়া শাসনের অবসানের পর এদের উৎপত্তি হয়। এদের প্রতিষ্ঠাতা ইবরাহীম বিন হারব বিন খালেদ বিন ইয়াযীদ। এরা অভিশপ্ত ইবলীসকে 'ভাল' বলে থাকে এবং তাকে মাল'উন বলতে অস্বীকার করে। কুরআনের যত জায়গায় 'লা'নত, শয়তান ও ইস্তি'আযাহ' শব্দ আছে তা পড়তে বারণ করে। তারা মিথ্যা দাবী করে যে, শব্দগুলি মূল কুরআনে নেই। মুসলমানরা পরে এগুলি কুরআনে যোগ করেছে। *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহ : (১) তারা অভিশপ্ত ইবলীসকে ফেরেশতাদের পাখি বলে এবং ময়ূর সদৃশ তামার মূর্তি বানিয়ে তার চতুর্দিকে তাওয়াফ করে। (২) তাদের নিকটে কালেমায়ে শাহাদাত হল, أشهد واحد الله، سلطان يزيد حبيب الله অর্থাৎ আমি এক আল্লাহ্র সাক্ষ্য প্রদান করছি এবং সুলতান ইয়াযীদকে আল্লাহর দোস্ত বলে সাক্ষ্য দিচ্ছি। (৩) তারা বছরে তিন দিন ছিয়াম পালন করে। তার মধ্যে একদিন হ'ল ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার জন্ম দিন। (৪) তারা প্রতি বছর ১০ই যিলহজ্জ ইরাকের মিরজাহ আন-নূরানিয়াহ পাহাড়ে অবস্থান করে। (৫) তারা মধ্য শা'বানে ছালাত আদায় করে এই বিশ্বাসে যে, এই ছালাত তাদের সারা বছরের ছালাতের স্থলাভিষিক্ত হবে। (৬) তাদের নিকটে মৃত্যুর পরে হাশর-নাশর হবে সিনজার পাহাড়ে। আর মীযানের পাল্লা থাকবে শায়খ আদী ইবনু মুসাফিরের হাতে। তিনিই মানুষের হিসাব গ্রহণ করবেন এবং তিনিই তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (৭) তাদের নিকটে ৬ টি পর্যন্ত বিবাহ করা জায়েয। এছাড়াও অনেক ভ্রান্ত আক্বীদায় তারা বিশ্বাস করে *(বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ আল-মাওসূ'আতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদইয়ান ওয়াল মাযাহেব ওয়াল আহযাব)*।

প্রশ্ন (১৩/৯৩) : ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করা যাবে কি? দলীল সহ জানতে চাই।

-বযলুর রশীদ, যশোর।

উত্তর : উক্ত নামে অনুষ্ঠান করা যাবে না। তবে কোনরূপ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই ঈদের সময় পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও একত্রে খানাপিনায় কোন দোষ নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার ভালবাসা তাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে যায় যারা আমার জন্য পরস্পরকে ভালবাসে, এক সাথে বসে, একে অপরের জন্য খরচ করে এবং পরস্পরের সাথে মিলিত হয় *(আহমাদ হা/২২৮৩৪; ছহীহুল জামে' হা/৪৩৩১; ছহীহ তারগীব হা/৩০১৯)*।

প্রশ্ন (১৪/৯৪) : টাখনুর নীচে কাপড় পরা, দাড়ি শেভ করা সহ বিবিধ কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ছালাত কবুল হবে কি?

-আক্কাছ আলী, ফরিদপুর।

উত্তর : এ সমস্ত পাপের জন্য ছালাত কবুল হ'তে বাধা নেই। কেননা ছালাত কবূলের শর্ত হ'ল, (১) আক্বীদা ছহীহ হওয়া। অর্থাৎ শিরক মুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া *(কাহফ ১৮/১১০)* (২) তরীকা ছহীহ হওয়া। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক হওয়া *(মুসলিম হা/১৭১৮)*। (৩) ইখলাছপূর্ণ হওয়া *(যুমার ৩৯/১১)*। অর্থাৎ কোনরূপ রিয়া বা শ্রুতির উদ্দেশ্য না থাকা। এছাড়া হাদীছে খাদ্য-পানীয় ও পোষাক হালাল হওয়াকে ইবাদত কবূলের অন্যতম শর্ত বলা হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*। আর ছালাত কবুলের বাহ্যিক নিদর্শন হ'ল সকল কবীরা গোনাহ হ'তে তওবা করা। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত কবীরা গোনাহসমূহ থেকে তওবা করতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত যাবতীয় ফাহেশা ও মুনকার কাজ থেকে মুছল্লীকে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*। আর তওবা করাটাই হবে ছালাত কবুলের নিদর্শন।

প্রশ্ন (১৫/৯৫) : মহিলাগণ চিকিৎসার ক্ষেত্রে মহিলা ডাক্তার না পাওয়ায় পুরুষ ডাক্তারের নিকটে যাওয়ায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : মহিলা ডাক্তার না পাওয়া গেলে বাধ্যগত অবস্থায় পুরুষ ডাক্তারের নিকটে যাওয়া যাবে। বদর, ওহোদ প্রভৃতি যুদ্ধে মহিলা ছাহাবীগণ আহত মুসলিম সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন *(বুখারী হা/৫৬৭৯, মুসলিম হা/১৮১০, মিশকাত হা/৩৯৪০)*। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী মহিলাদের সতরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা চিকিৎসকের জন্য জায়েয *(বুখারী হা/৩০০৭; ইবনু কুদামা, মুগনী ৬/৫৫৬)*। তবে সম্ভব হ'লে একজন মাহরাম পুরুষ সাথে নিবে *(বুখারী হা/৩০০৬, মিশকাত হা/৩১১৮)*।

প্রশ্ন (১৬/৯৬) : স্ত্রী বিদেশে অবস্থানরত তার স্বামীকে ডিভোর্স দিতে চায়, কিন্তু স্বামী তাতে ইচ্ছুক নয়। এক্ষেত্রে উক্ত স্ত্রীর করণীয় কি?

-মেহেদী হাসান, ঢাকা।

উত্তর : স্ত্রী যদি বৈধ কারণে ডিভোর্স দিতে চায় এবং স্বামী তাতে অসম্মত হয়, তবে স্ত্রীকে আদালতের অথবা ধর্মীয় নেতাদের সাহায্য নিতে হবে। তারা স্ত্রীকে প্রদত্ত স্বামীর দেনমোহর ফেরত প্রদানের মাধ্যমে উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। ছাবিত বিন ক্বায়েস-এর স্ত্রীকে এভাবে 'খোলা'-র মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৫২৭৩; নাসাঈ হা/৩৫১০; মিশকাত হা/৩২৭৪)*।

প্রশ্ন (১৭/৯৭) : কুরবানী একটির বেশী করা জায়েয হবে কি?

-শামাউন, মির্জাপুর, ঝাড়খণ্ড, ভারত।

উত্তর : সামর্থ্য থাকলে একাধিক কুরবানী করায় কোন বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ পরিবার ও উম্মতের পক্ষ হ'তে দু'টি 'খাসি' কুরবানী করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৫৩)*। এছাড়া বিদায় হজ্জের দিন তিনি একশত উট কুরবানী করেছিলেন *(ইবনু মাজাহ হা/৩০৭৬)*। তবে নিজ ও পরিবারের পক্ষে একটি ছাগল কুরবানী করাই যথেষ্ট *(মুসলিম হা/১৯৬৭, মিশকাত হা/১৪৫৪)*। তাবেঈ বিদ্বান 'আতা বিন ইয়াসার (রহঃ) বলেন, আমি আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে কুরবানী কেমন ছিল সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'সেসময় একজন লোক একটি ছাগল দ্বারা নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ হ'তে কুরবানী দিতেন। অতঃপর তা খেতেন ও অন্যকে খাওয়াতেন। অতঃপর লোকেরা তাতে বড়াই করত। তারপর সেটাই আছে যেমনটা তুমি দেখছ' *(তিরমিযী হা/১৫০৫, ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৭)*। ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) বলেন, সুন্নাত জানার পর আমি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বা দু'টি কুরবানী দিতাম। লোকেরাও পরিবারপিছু একটি বা দু'টি করে বকরী কুরবানী দিত। অথচ এখন প্রতিবেশীরা আমাদের বখীল বলছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৮)*।

প্রশ্ন (১৮/৯৮) : কোন দলীলের ভিত্তিতে ফজর, মাগরিব ও এশার ছালাতে সরবে এবং যোহর ও আছর ছালাতে নীরবে তেলাওয়াত করা হয়? দলীলভিত্তিক জবাব চাই।

-অধ্যাপক সফিউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখছ সেভাবে তোমরা ছালাত আদায় কর' *(বুখারী হা/৬৩১; মিশকাত হা/৬৮৩)*। তিনি মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাতে সশব্দে এবং যোহর ও আছর ছালাতে নিম্নস্বরে কিরাআত পাঠ করেছেন *(বুখারী হা/৭১৩, ৭৩৫, ৭৩৯, ৭৭৩; মিশকাত 'ছালাত' অধ্যায় দ্রঃ)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, সুন্নাত হ'ল মাগরিব ও এশার প্রথম দু'রাক'আতে এবং ফজর ও জুম'আর ছালাতে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ করা। অন্য দিকে যোহর, আছর ও মাগরিবের ৩য় রাক'আতে এবং এশার শেষ দু'রাক'আতে নিম্নস্বরে কিরাআত পাঠ করা *(আল-মাজমূ', শারহুল মুহাযযাব ৩/৩৮৯)*।

প্রশ্ন (১৯/৯৯) : জিনের সাথে মানুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশনা কি?

-আব্দুল মালেক, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : মানুষের সাথে জিনের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের পসন্দমত দুই,

তিন বা চারজন নারীকে বিবাহ কর' *(নিসা ৪/৩)*। তিনি বলেন, আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হ'তেই জোড়া (স্ত্রী) সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জোড়া (স্ত্রী) হ'তে তোমাদের জন্য সন্তান ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন *(নাহল ১৬/৭২)*। অত্র আয়াতগুলো দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে মানুষের স্ত্রী মানুষই হবে, জিন বা অন্য কোন প্রাণী নয়।

প্রশ্ন (২০/১০০) : জনৈক বক্তা বলেন, সন্তানহীনা নারী ৪০ দিন সাদা লজ্জাবতী গাছ পেটে বাঁধলে এবং ৪০ দিন দরূদে ইবরাহীমী পাঠ করলে সন্তান হবে। এর প্রমাণসূত্র তাফসীর ইবনে কাছীর বলে উল্লেখ করেছেন। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-তহূরা আখতার, গুহলক্ষীপুর, ফরিদপুর।

উত্তর : বন্ধ্যাত্ব দূর করার জন্য প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং কুসংস্কার মাত্র। তাফসীর ইবনে কাছীরে উক্ত বর্ণনার কোন অস্তিত্ব নেই। বরং আরোগ্য লাভের জন্য শরীরে কোন কিছু ঝুলালে তা শিরক হবে। চাই তা তাবীয হোক বা অন্য কিছু হোক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি শরীরে কোন কিছু ঝুলাল, তাকে তার কাছেই সোপর্দ করা হ'ল' *(আহমাদ হা/১৮৮০৩; তিরমিযী হা/২০৭২; মিশকাত হা/৪৫৫৬, সনদ হাসান)*। তাই শিরকী পদ্ধতি ছেড়ে উন্নত চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে এবং আল্লাহ্র কাছে বেশী বেশী ইস্তিগফার ও সন্তান লাভের জন্য দো'আ করতে হবে। যেমন করেছিলেন ইবরাহীম *(ছাফফাত ৩৭/১০০)* এবং যাকারিয়া *(আম্বিয়া ২১/৮৯-৯০)* আলাইহিমুস সালাম।

কোন কোন ছহীহ নামায শিক্ষায় 'বন্ধ্যা নারীর সন্তান লাভ' শিরোনামে সূরা ইনশিক্বাক্ব-এর প্রথম পাঁচ আয়াত লিখে বন্ধ্যা নারীর গুপ্তাঙ্গে বেঁধে দিলে অবশ্যই সন্তান হবে বলা হয়েছে। এগুলি কবীরা গোনাহ। এথেকে তওবা করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, সন্তান দেওয়া না দেওয়ার মালিক আল্লাহ। এতে কারু কোন হাত নেই। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং তার গর্ভাশয়ে যা সংকুচিত হয় ও বর্ধিত হয়। বস্তুতঃ তাঁর নিকটে প্রত্যেক বস্তুরই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে' *(রা'দ ১৩/৮)*।

প্রশ্ন (২১/১০১) : রাসূল (ছাঃ) কি নূরের না মাটির তৈরী? তিনি যে নূরের তৈরী সূরা মায়েদার ১৫নং আয়াত কি তার প্রমাণ নয়? বিস্তারিত জানতে চাই।

-আশরাফুল ইসলাম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাটির মানুষ ছিলেন; নূরের তৈরী নন। আল্লাহ বলেন, '(হে নবী!) 'তুমি বলে দাও, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র। (পার্থক্য হ'ল) আমার নিকট 'অহি' করা হয় ...' *(কাহফ ১৮/১১০)*। এটা কেবল আমাদের নবীই নন, বরং বিগত সকল নবীই স্ব স্ব কওমের উদ্দেশ্যে একথা বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের মত মানুষ মাত্র' *(ইবরাহীম ১৪/১১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি তো একজন মানুষ। আমিও তোমাদের মত ভুলে যাই। সুতরাং আমি (ছালাতে কিছু) ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো' *(বুখারী হা/৪০১; মুসলিম হা/৫৭২; মিশকাত হা/১০১৬ 'সিজদায়ে সহো' অনুচ্ছেদ)*। তিনি বলেন, আমি একজন মানুষ। আমি তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোন কিছু আদেশ করলে তা গ্রহণ করবে। আর নিজস্ব রায় থেকে কিছু বললে আমি একজন মানুষ মাত্র। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে আমার ভুলও হ'তে পারে *(মুসলিম হা/২৩৬৫, মিশকাত হা/১৪৭)*।

বস্তুতঃ ফেরেশতারা হ'ল নূরের তৈরী, জিনেরা আগুনের তৈরী এবং মানুষ হ'ল মাটির তৈরী *মুসলিম হা/২৯৯৬; মিশকাত হা/৫৭০১; মুমিনূন ২৩/১২, আন'আম ৬/২)*।

উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) নূরের তৈরী ছিলেন মর্মে সমাজে কিছু হাদীছ প্রচলিত রয়েছে। যেমন 'আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেন'। এ মর্মে বর্ণিত সব বর্ণনাই জাল *('আজলূনী, কাশফুল খাফা হা/৮২৭; ছহীহাহ হা/৪৫৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

সূরা মায়েদাহ ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ 'তোমাদের কাছে এসেছে একটি জ্যোতি এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ'। উক্ত আয়াতে 'নূর' বা জ্যোতি দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন শিরকের অন্ধকার হ'তে মানুষকে তাওহীদের আলোর পথে বের করে আনে। এখানে 'ওয়া কিতাবুম মুবীন' (وَكِتَابٌ مبِيْنٌ) তার পূর্ববর্তী 'নূর' (نُوْرٌ)-এর উপর عطف بيان হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন, 'তোমাদের কাছে আল্লাহ্র নিকট থেকে এসেছে একটি জ্যোতি ও সমুজ্জ্বল গ্রন্থ'। যেমন ইতিপূর্বে সূরা নিসা ১৭৪-৭৫ আয়াতে نُوْرًا مُبِيْنًا ও بُرْهَانٌ বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। অমনিভাবে সূরা আ'রাফ ১৫৭ আয়াতের কুরআনকে 'নূর' বলা হয়েছে।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে 'নূর'-এর ব্যাখ্যায় যাজ্জাজ বলেন, এখানে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। যদি সেটাই ধরে নেওয়া হয়, তাহ'লেও এর অর্থ এই নয় যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) নূরের তৈরী ছিলেন। কারণ কুরআনেই বলা হয়েছে যে, তিনি তোমাদের মত মানুষ ছিলেন' *(কাহফ ১৮/১১০)*। আর মানুষ বলেই তো তিনি পিতা-মাতার সন্তান ছিলেন এবং সন্তানের পিতা ছিলেন। তিনি খানা-পিনা ও বাজার-ঘাট করতেন। অতএব রাসূল (ছাঃ) যে মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রশ্ন (২২/১০২) : ঔষধ খাওয়ার সময় পাঠ করার জন্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ আছে কি?

-কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ঔষধ খাওয়ার পূর্বে নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই। অতএব 'বিসমিল্লাহ' বলাই যথেষ্ট হবে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ কিছু খাবে তখন সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে সে যেন বলে, *'বিসমিল্লাহি আউওয়ালাহু ওয়া আ-খিরাহূ'* । অর্থ, উহার শুরুতে ও শেষে 'বিসমিল্লাহ' *(আবুদাঊদ হা/৩৭৬৭; মিশকাত হা/৪২০২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪৪)*।

প্রশ্ন (২৩/১০৩) : কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ছালাত বিনষ্টের কারণ সমূহ কি কি?

-সোবহান মুনশী
যেলা পরিষদ অফিস, ফরিদপুর।

উত্তর : (১) ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশতঃ ছালাতের কোন শর্ত বা রুকন ছুটে যাওয়া। যেমন ওযূ নষ্ট হওয়া *(মায়েদাহ ৫/০৬)*, ক্বিয়াম, রুকূ বা সিজদা না করা *(বাক্বারাহ ২/২৩৮, হজ্জ ২২/৭৭)*, প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা না পড়া *(বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪)* ইত্যাদি। (২) ছালাতরত অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলা ও খাওয়া বা পান করা *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০৩, বাক্বারাহ ২/২৩৮; বুখারী হা/১২০০; মুসলিম হা/৫৩৯)* (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে বাহুল্য কাজ করা। যা দেখলে ধারণা হয় যে, সে ছালাতের মধ্যে নেই। (৪) ছালাতের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করা *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/৬১৪)* (৫) ইচ্ছাকৃতভাবে সতর প্রকাশ করা *(আ'রাফ ৭/৩১; আবুদাউদ হা/৬২৭; বুখারী হা/৩৬১; মুসলিম হা/৩০১০)* (৬) ইচ্ছাকৃতভাবে ক্বিবলামুখী না হওয়া *(বাক্বারাহ ২/১৪৪; বুখারী হা/৬২৫১; মুসলিম হা/৩৯৭)* (৭) জানা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে অপবিত্র স্থানে ছালাতে দাঁড়ানো *(বুখারী হা/২২০)* (৮) একাকী ছালাত আদায়কারী বা ইমামের সম্মুখস্থ সিজদার স্থান দিয়ে বালেগা নারী, গাধা ও কালো কুকুর (শয়তান) অতিক্রম করা *(মুসলিম হা/৫১০, ইবনু মাজাহ হা/৯৪৯)* (৯) ওযর ব্যতীত কোন কিছুতে হেলান দিয়ে ছালাত আদায় করা *(বাকারাহ ২/২৩৮; বুখারী হা/১১১৭)* (১০) ছালাতের রুকনগুলি ধারাবাহিকভাবে পালন না করা *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৩)। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০৫ পৃঃ; ফিকহুল মুয়াস্সার পৃঃ ৫৭-৫৮)।*

প্রশ্ন (২৪/১০৪) : শিরকী আক্বীদা ও আমলে লিপ্ত পিতা-মাতার যুবতী কন্যা ছহীহ আক্বীদা-আমল গ্রহণ করার পর আহলেহাদীছ পরিবারে বিবাহের ব্যাপারে পিতা-মাতার অমতের কারণে তাদের উপেক্ষা করে অন্য কোন নিকটাত্মীয়ের অভিভাবকত্বে বিবাহ করতে পারবে কি?

-ছাবির আলী মোল্লা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : মেয়ের বিবাহের ক্ষেত্রে অলী বা অভিভাবকের অনুমতি আবশ্যক *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩০)*। তবে স্রেফ আক্বীদাগত কারণেই যদি পিতা বাধা হয়ে দাঁড়ান, সেক্ষেত্রে পরিবারের অন্য সদস্য বা সমাজের মুসলিম ধর্মীয় নেতা অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে বিবাহ দিবেন। কেননা আল্লাহ বলেন, 'যদি তারা (পিতা-মাতা) তোমাকে শিরক করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে, তখন তুমি তাদের আনুগত্য করো না। তবে পার্থিব বিষয়ে তাদের সাথে সদাচরণ করো' *(লোকমান ৩১/১৫)*।

প্রশ্ন (২৫/১০৫) : হাদীছে মোটা-তাজা সুন্দর পশু কুরবানী করতে বলা হয়েছে। এক্ষণে ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে পশু মোটাতাজা করণে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-রাণা হামীদ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে বা ট্যাবলেট খাইয়ে পশু মোটাতাজাকরণ অত্যন্ত গর্হিত কাজ। যা আদৌ শরী'আতসম্মত নয়। কেননা এর মাধ্যমে ক্রেতার সাথে প্রতারণা করাই লক্ষ্য থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। প্রতারণা করা ও ধোঁকা দেওয়ার কারণে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৬৭, মুসলিম হা/১০২, ছহীহাহ হা/১০৫৮)*। উপরন্তু এসব ব্যবহারে পশুর গোশত বিষাক্ত হয়ে যায়, যা মানবদেহের জন্য চরম ক্ষতিকর। এতে মানুষ লিভার, কিডনী, ক্যান্সার ও হৃদরোগসহ নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ক্ষতি করো না ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না' *(ইবনে মাজাহ হা/২৩৪১)*।

প্রশ্ন (২৬/১০৬) : দু'টি সন্তানের একজনকে পিতা-মাতা বিদেশে বহু অর্থ খরচ করে পড়াশোনা করাচ্ছেন। কিন্তু অন্য সন্তানের পড়াশুনার দিকে তেমন কোনই খেয়াল রাখেন না। এরূপ করায় পিতা-মাতা কি স্বাধীন না এর জন্য কিয়ামতের দিন জবাবদিহী করতে হবে?

-আমানুল্লাহ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সন্তানের আগ্রহ, স্বাস্থ্য, মেধা ও যোগ্যতার মান ভেদে তাকে উৎসাহিত করা ও তার জন্য সাধ্যমত ব্যয় নির্বাহ করা পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এতে কমবেশী হওয়ায় কোন দোষ নেই। তবে কারো প্রতি ইচ্ছাকৃত অবহেলা চরম নিন্দনীয় বিষয়। আর ভরণ-পোষণ ও সম্পত্তি বণ্টনে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে। নইলে তাঁরা পরকালে আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ইনছাফ বজায় রাখ' *(বুখারী হা/১৫৮৭; মিশকাত হা/৩০১৯)*। তিনি বলেন, (ক্বিয়ামতের দিন) স্বামী তার পরিবার সম্পর্কে এবং স্ত্রী তার স্বামীর সংসার ও সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'ইমারত ও বিচার' অধ্যায় হা/৩৬৮৫)*।

প্রশ্ন (২৭/১০৭) : কোন মসজিদে গেটে আজমীরের পীরবাবার ছবি লাগানো থাকলে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুনীরুদ্দীন
ওমরপুর, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : মসজিদের ভিতরে গিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে। কিন্তু যদি কেউ উক্ত ছবির বরকত লাভের উদ্দেশ্যে উক্ত মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করে, তবে তা শিরক হবে। আর ঐ ছবি অবশ্যই সরিয়ে ফেলতে হবে। কেননা ইসলামে ছবি-মূর্তি হারাম। আর মসজিদের গেটে বা দেওয়ালে লাগানো আরো বেশী হারাম।

প্রশ্ন (২৮/১০৮) : ইবাদতের শুরুতে মুখে নিয়ত পড়তে হবে, না অন্তরে সংকল্প করলেই যথেষ্ট হবে?

-আজীবর রহমান মন্টু
কাঁকড়া, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তর : হৃদয়ে সংকল্পই যথেষ্ট হবে। মুখে পাঠ করা বিদ'আত। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কখনো মুখে

উচ্চারণ করে নিয়ত পাঠ করেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যেখানে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী হা/১০৯২)*। বিশিষ্ট হানাফী বিদ্বান মোল্লা আলী ক্বারী, কামাল ইবনুল হুমাম, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (রহঃ)ও মুখে নিয়ত পাঠ করাকে বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করেছেন *(মিরক্বাত শরহ মিশকাত (দিল্লী ছাপা) ১/৪০-৪১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৯/১০৯) : ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের নিকটে এসে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আল্লাহর কাছে আপনার উম্মতের জন্য পানি প্রার্থনা করুন। তারা তো ধ্বংস হয়ে গেল'- এ ঘটনার সত্যতা আছে কি?

-আব্দুল ক্বাইয়ূম, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : আছারটি বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন মালেকুদ্দার বলেন, ওমর (রাঃ)-এর যুগে লোকেরা দুর্ভিক্ষে পতিত হ'ল। তখন জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের নিকটে এলো এবং বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার উম্মতের জন্য পানি প্রার্থনা করুন। কারণ তারা ধ্বংস হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল স্বপ্নে ঐ ব্যক্তির নিকটে এলেন এবং তাকে বলা হ'ল, 'তুমি ওমরের নিকটে যাও ও তাকে আমার সালাম বল। তাকে খবর দাও যে, তোমরা পানি প্রার্থী। আর তাকে বল, তুমি সাধ্যমত জনগণের সেবা কর। অতঃপর ঐ ব্যক্তি ওমরের নিকটে এল এবং তাকে এ খবর দিল। তখন ওমর (রাঃ) ক্রন্দন করলেন এবং বললেন, হে আমার প্রতিপালক আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব' *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩২০০২, ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৩/৫৬; বুখারী, তারীখুল কাবীর ৭/৩০৪)*।

আছারটির সনদ যঈফ, যা থেকে দলীল গ্রহণ করা যায় না। কারণ (১) ঘটনাটি সঠিক নয়। (২) রাবী মালেকুদ্দার ন্যায়পরায়ণতা এবং স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে অপরিচিত। যা মুহাদ্দেছীনের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় (৩) এটি শরী'আতের বিরোধী। কেননা দুর্ভিক্ষের জন্য শরী'আতে ইস্তিসক্বার ছালাত আদায়ের বিধান রয়েছে। স্বয়ং ওমর (রাঃ) ইস্তিসক্বার ছালাত আদায় করেছেন এবং আব্বাস (রাঃ)-এর অসীলায় আল্লাহ্র নিকটে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন *(বুখারী হা/১০১০; মিশকাত হা/১৫০৯)*। (৪) ছাহাবায়ে কেরামের কারু থেকে এমন কোন আমল পাওয়া যায় না যে তারা দুর্ভিক্ষের সময় রাসূল (ছাঃ)-এর কবরে গিয়েছেন এবং তাঁর নিকটে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন। যদি এটি শরী'আতসম্মত হ'ত, তাহ'লে খলীফা হিসাবে ওমর (রাঃ) নিজেই সর্বাগ্রে কবরের নিকটে যেতেন এবং রাসূল (ছাঃ) সরাসরি তাঁকেই স্বপ্ন দেখাতেন। (৫) সর্বোপরি এটি কুরআনের আয়াতের বিরোধী। যেখানে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেন, তুমি কোন কবরবাসীকে শুনাতে পারো না' *(নমল ২৭/৮০. ফাত্বির ৩৫/২২)*। মূলতঃ কবরপূজারীদের স্বার্থের অনুকূলে হওয়ায় তারা ভিত্তিহীন এই কাহিনীটিকে বিশুদ্ধ প্রমাণের জন্য গলদঘর্ম হয়ে থাকে। *(বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ নাছিরুদ্দীন আলবানী, আত-তাওয়াস্সুল পৃঃ ১২০-২৪)*।

প্রশ্ন (৩০/১১০) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি মৃত্যুবরণ করেছেন না জীবিত রয়েছেন?

-বাদশা মণ্ডল, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*। তিনি স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে। যেমন তারা (বিগত নবীরা) মৃত্যুবরণ করেছে' *(যুমার ৩৯/৩০)*। ৬৩ বছর বয়সে রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করার পর আবুবকর (রাঃ) বলেছিলেন, 'যারা মুহাম্মাদ-এর ইবাদত করে তারা জেনে রাখুক যে, মুহাম্মাদ মারা গেছেন। আর যারা আল্লাহ্র ইবাদত করে, তারা জেনে রাখুক যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি অমর' *(বুখারী হা/৩৬৬৮)*।

উল্লেখ্য, কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উম্মতের দরূদ ও সালাম পৌঁছানো হয় *(নাসাঈ; মিশকাত হা/৯২৪)* দ্বারা তাঁর জীবিত থাকার প্রমাণ পেশ করেন। অথচ এখানে সালাম অর্থ দো'আ। চাই তা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে হৌক বা দূর থেকে হৌক। দ্বিতীয়তঃ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বারযাখী জীবনের অন্তর্ভুক্ত। যেখানে মানুষের হায়াত বা মঊত বলে কিছু নেই। তাই রূহ ফেরত দেওয়ার অর্থ তাঁকে অবহিত করানো এবং তিনি তা বুঝতে পারেন। আর সেটাই হ'ল তাঁর উত্তর দেওয়া *(মির'আত হা/৯৩১-এর ব্যাখ্যা, ৪/২৬২-৭৪)*।

বারযাখী জীবন দুনিয়াবী জীবনের সাথে তুলনীয় নয়। অতএব এ হাদীছগুলির মাধ্যমে 'হায়াতুন্নবী' প্রমাণের কোন অবকাশ নেই। বরং এটা পরিষ্কারভাবে শিরকী আক্বীদা। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবরের নিকটে গিয়ে দরূদ পাঠ করলে তিনি শুনতে পান মর্মে বায়হাক্বী বর্ণিত হাদীছটি 'জাল' *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৩)*। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃত ব্যক্তিকে' *(নামল ২৭/৮০)*। আর 'তুমি শুনাতে পারো না কোন কবরবাসীকে' *(ফাত্বির ৩৫/২২)*।

প্রশ্ন (৩১/১১১) : অনেক আলেম বলেন. ফিৎরা খেজুর বা যব দিয়ে দিতে হবে। এছাড়া অন্য কিছু দিয়ে দেওয়া যাবে না। ফলে অনেক মানুষ টাকা দিয়ে এগুলি কিনে ফিৎরা দেয়। এটা শরী'আতসম্মত হবে কি?

*-গোলাম মোছতফা**

সন্তোষপুর, কলিকাতা, ভারত।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা খেজুর ও যব ছাড়াও অন্যান্য হালাল খাদ্যদ্রব্য অথবা মানুষের প্রধান খাদ্য দ্বারা ফিৎরা আদায়ের কথা হাদীছে স্পষ্টভাবে এসেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَدُّوْا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ فِي الْفِطْرِ 'তোমরা ছাদাক্বাতুল ফিৎর আদায় কর এক ছা' খাদ্যশস্য দ্বারা' (*ছহীহুল জামে' হা/২৪২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৭৯*)। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, 'আমরা এক ছা' খাদ্যশস্য, এক ছা' যব, এক ছা' খেজুর, এক ছা' পনির বা এক ছা' কিশমিশ থেকে যাকাতুল ফিৎর বের করতাম' *(বুখারী হা/১৫০৬; মুসলিম হা/৯৮৫; মিশকাত হা/১৮১৬)*।

অত্র হাদীছে যাকাতুল ফিৎর প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের নাম সহ সাধারণভাবে 'ত্ব'আম' বা খাদ্যের কথা এসেছে, যা মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রধান খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। অতএব প্রত্যেক দেশের প্রধান খাদ্য দ্বারা ফিৎরা প্রদান করাই শরী'আত সম্মত।

* নামটি শিরকযুক্ত। অতএব কেবল 'মুছতফা' বা 'গোলাম রহমান' রাখুন (স.স.)।

প্রশ্ন (৩২/১১২) : হাদীছে এসেছে, তোমরা অমুসলিমদের রাস্তার সংকীর্ণ স্থানের দিকে ঠেলে দাও। এক্ষণে অমুসলিমদের সাথে আমাদের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত? তাদের সম্মান করলে বা কোন হাদিয়া দিলে গোনাহ হবে কি?

-আল-আমীন, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : হাদীছটি নিম্নরূপ : তোমরা ইহূদী-নাছারাদেরকে প্রথমে সালাম দিয়ো না। যখন তোমরা তাদের কাউকে রাস্তায় পাবে, তখন তাকে রাস্তার সংকীর্ণ স্থানের দিকে যেতে বাধ্য করো *(মুসলিম হা/২১৬৭, মিশকাত হা/৪৬৩৫)*।

যেসব অমুসলিম মুসলমানদের সাথে ধর্মের কারণে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং শত্রুতা করে, তাদের বিষয়ে উক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি ওদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছ, অথচ ওরা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে? রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহতে বিশ্বাস কর' *(মুমতাহিনা ৬০/১)*।

তবে সাধারণভাবে অমুসলিমদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। যাতে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আল্লাহ বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হ'তে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করতে ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন' *(মুমতাহিনা ৬০/৮)*।

প্রশ্ন (৩৩/১১৩) : আহলেহাদীছগণ ফিরক্বা নাজিয়াহ হওয়া সত্ত্বেও এদের মাঝে এত দলাদলির কারণ কি?

-আলমগীর, খুলনা।

উত্তর : আক্বীদাগতভাবে সকল আহলেহাদীছই এক। শরী'আতের ব্যাখ্যাগত পার্থক্যের কারণে কিছু প্রশাখাগত বিষয়ে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। এছাড়া অন্যান্য যেসব বিভেদ দেখা যায়, তা অনেক সময় দুনিয়াবী স্বার্থদ্বন্দ্ব ও মনের রোগ থেকে সৃষ্টি হয়। এজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ দায়ী হবেন। আল্লাহ্র নিকট তাদের জওয়াবদিহী করতে হবে এবং শাস্তি ভোগ করতে হবে *(বাক্বারাহ ২/১৩৭; আলে ইমরান ৩/১০৫; আন'আম ৬/১৫৯)*। অবশ্য যদি কোন আহলেহাদীছ নামধারী ব্যক্তি কুফরী বা বিদ'আতী আক্বীদা পোষণ ও লালন করেন এবং জেনে-শুনে যিদ বশতঃ ছহীহ হাদীছ মানতে অস্বীকার করেন, তবে তিনি প্রকৃত অর্থে আহলেহাদীছ নন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম এবং মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের ভাষ্য অনুযায়ী কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী আহলেহাদীছগণই কেবল নাজাতপ্রাপ্ত দল *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬২৮৩, ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৬০৩২; বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ; বিস্তারিত আলোচনা দেখুন: 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন' বই)*।

উল্লেখ্য, রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী- 'আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে' *(তিরমিযী হা/২৬৪১, ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২; মিশকাত হা/১৭১-১৭২)* বলতে আক্বীদাগত বিভক্তিকে বুঝানো হয়েছে। ৩৭ হিজরীর পর থেকে যার উদ্ভব ঘটে। ফলে খারেজী ও শী'আ এবং পরবর্তীতে ক্বাদারিয়া, জাবরিয়া, মুরজিয়া, মু'তাযিলা সহ হাযারো দল ও মতের প্রচলন ঘটে। নামে-বেনামে যা আজও রয়েছে। অতএব যেকোন মূল্যে ফিরক্বা নাজিয়াহ্র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩৪/১১৪) : খিযির (আঃ) কি এখনও বেঁচে আছেন? 'কাছাছুল আম্বিয়া' কিতাবে লেখা আছে যে, 'ইলইয়াস ও খিযির (আঃ) উভয়ে বেঁচে আছেন এবং প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে তারা পরস্পরে সাক্ষাৎ করেন'। উক্ত কথাগুলির সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল মান্নান, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তর : খিযির বা ইলিয়াস (আঃ) কেউ-ই এখন বেঁচে নেই। আল্লাহপাক স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে, যেমন (তোমার পূর্বের) নবীগণ মৃত্যুবরণ করেছেন' *(যুমার ৩৯/৩০)*। তিনি বলেন, তোমার পূর্বে কোন মানুষকে আমি স্থায়ী জীবন দান করিনি *(আম্বিয়া ২১/৩৪)*। তিনি বলেন, 'তুমি কোথাও আল্লাহ্র নিয়মের ব্যতিক্রম পাবে না' *(ফাত্বির ৩৫/৪৩)*। অতএব যদি দুনিয়া কারু জন্য চিরস্থায়ী হ'ত, তাহ'লে শ্রেষ্ঠ মানুষ ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) চিরস্থায়ী জীবন লাভ করতেন। তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেছেন, তখন অন্যদের বেঁচে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। খিযির (আঃ) 'আবে হায়াৎ' পান করে আজও বেঁচে আছেন বলে যে কথা চালু আছে, এগুলি 'ইস্রাঈলিয়াত' (الإسـرائيليات)-এর অন্তর্ভুক্ত। আবু জা'ফর আল-মুনাদী এ বিষয়ে বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেখানে এসবের অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে *(দ্রঃ ফাৎহুল বারী ৮/২৬৮ পৃঃ, হা/৪৭২৬-এর ব্যাখ্যা 'তাফসীর' অধ্যায় ৩নং অনুচ্ছেদ)*।

'ইলিয়াস ও খিযির (আঃ) উভয়ে বেঁচে আছেন এবং প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে তারা পরস্পরে সাক্ষাৎ করেন' এ বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই বানোয়াট বা ভিত্তিহীন *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৩৩৭; ঐ, তাফসীর সূরা কাহফ ৮২ আয়াতের আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (৩৫/১১৫) : তোমরা আল্লাহ্র রংয়ে রঞ্জিত হও বা আল্লাহ্র চরিত্রে চরিত্রবান হও' মর্মে বর্ণনাটির সত্যতা জানতে চাই।

-যাকারিয়া, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর।

উত্তর : উক্ত বর্ণনাটি ভিত্তিহীন *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮২২)*। এ বর্ণনা সম্পর্কে ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'এইরূপ শব্দে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন বর্ণনা কোন হাদীছ গ্রন্থে এসেছে বলে জানা যায় না এবং কোন বিদ্বানের নিকট এটি পরিচিত নয়। বরং তাদের নিকটে এটি মওযূ' বা জাল' *(ইবনু তায়মিয়াহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়াহ ৬/৫১৮)*।

Contents

উল্লেখ্য, আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহ্র রং। আর আল্লাহ্র রংয়ের চাইতে উত্তম রং কার আছে? আমরা তাঁরই ইবাদত করি' *(বাক্বারাহ ২/১৩৮)* এর অর্থ, তোমরা আল্লাহ্র দ্বীনকে অপরিহার্য রূপে ধারণ কর। তার চাইতে উত্তম দ্বীন কার আছে? আর তোমরা বল যে, আমরা সবাই আমাদের রব-এর ইবাদত করি।

প্রশ্ন (৩৬/১১৬) : কোন কোন ক্ষেত্রে ছালাত তরক করা ওয়াজিব? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ, তায়েফ, সঊদী আরব।

উত্তর : ওযর ব্যতীত ছালাত তরক করা মুছল্লীর জন্য হারাম। তবে যরূরী কারণে ছালাত তরক করা যায়। যেমন, বিপদগ্রস্ত বা ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা বা অনুরূপ কোন অবস্থায় ছালাত পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। এছাড়া সন্তানের ক্রন্দন, হাড়ি উথলে ওঠা, বাহন চলে যাওয়া, মাল বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি কারণে ছালাত পরিত্যাগ করা যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০৪, টীকা-২)*। যেমন চোর ধরার জন্য ফরয ছালাত ছেড়ে দেয়ার অনুমতি রয়েছে *(বুখারী হা/১২১১)*।

প্রশ্ন (৩৭/১১৭) : আল্লাহ সবকিছু জানেন ও দেখেন। এছাড়া পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বেই তিনি ভাগ্য এমনকি জান্নাতী না জাহান্নামী তা নির্ধারণ করে রেখেছেন। এক্ষণে বান্দার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের জন্য কিরামান কাতেবীন নিয়োগ করার পিছনে কি তাৎপর্য আছে?

-আমীর হামযা, চালা, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : বান্দাকে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রমাণ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে এটা করা হয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কি ভেবেছ জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখনো জেনে নেননি কারা তোমাদের মধ্যে জিহাদ করেছে এবং কারা তোমাদের মধ্যে ধৈর্যশীল'? *(আলে ইমরান ৩/১৪২)*। যাতে বান্দা নিজেই নিজের আমলনামা দেখে নিশ্চিত হয়। যেমন কিয়ামতের দিন আমলনামা হাতে দিয়ে তিনি বলবেন, 'তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট' *(ইসরা ১৭/১৪)*।

প্রশ্ন (৩৮/১১৮) : হিন্দু বা খৃষ্টান কোন বন্ধু অভিবাদন বিনিময়ের পর যদি মুছাফাহা বা কোলাকুলির জন্য এগিয়ে আসে, সেক্ষেত্রে করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ নাযিম, মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তর : এরূপ ক্ষেত্রে তার সাথে মুছাফাহা ও মু'আনাক্বা করা যাবে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আহকামু আহলিয যিম্মাহ ১/৪২৫)*। আল্লাহ বলেন, 'আর যখন তোমরা সম্ভাষণ প্রাপ্ত হও, তখন তার চেয়ে উত্তম সম্ভাষণ প্রদান কর অথবা ওটাই প্রত্যুত্তর কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী' *(নিসা ৪/৮৬)*।

প্রশ্ন (৩৯/১১৯) : সূরা ইউসুফের ১০০ আয়াতে পিতা-মাতাকে সিজদা করা যায় বলে প্রমাণ মেলে। এক্ষণে কাউকে সম্মান ও শ্রদ্ধাবশতঃ সিজদা করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-মোল্লা সুজন, আমীনপুর, পাবনা।

উত্তর : ইয়াকূবী শরী'আতে সম্মানের সিজদা করা জায়েয ছিল *(ইবনু কাছীর, ঐ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*। কিন্তু মুহাম্মাদী শরী'আতে এটি হারাম করা হয়েছে এবং এভাবে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি সিজদা করার দূরতম সম্ভাবনাকেও মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। মু'আয (রাঃ) শাম থেকে ফেরার পর রাসূল (ছাঃ)-কে সিজদা করলে তিনি বললেন, কি ব্যাপার হে মু'আয! তিনি বললেন, আমি শামে গিয়ে দেখলাম, সেখানকার অধিবাসীরা তাদের পোপ ও পাদ্রীদেরকে সিজদা করে। তাই আমি আপনার ক্ষেত্রেও তাদের মত করার ইচ্ছা করেছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা এটা করো না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে যদি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহ'লে স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রতি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম। যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম করে বলছি, কোন নারী ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রভুর হক পূরণ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার স্বামীর হক পূরণ না করবে.... *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৩, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২০৩)*। একইভাবে রাসূল (ছাঃ) ক্বায়েস বিন সা'দ (রাঃ)-কেও এ থেকে নিষেধ করেছিলেন। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যমতে হারাম *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/৩৫৮)*।

প্রশ্ন (৪০/১২০) : জনৈক আলেম বলেন, প্রত্যেক মানুষ ও জিনের সাথে শয়তান থাকে। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথেও ছিল। এ বক্তব্যের কোন সত্যতা আছে কি?

-ইবনে আবেদ আলী

মিলনবাজার, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সঙ্গে তার একজন জিন সহচর ও একজন ফেরেশতা সহচর নিযুক্ত করা হয়নি'। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার সাথেও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমার সাথেও। তবে আল্লাহ তার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। ফলে সে আমার অনুগত হয়ে গেছে। সে আমাকে ভাল ব্যতীত (মন্দ-কাজে) পরামর্শ দেয় না' *(মুসলিম হা/২৮২৪, মিশকাত হা/৬৭)*।

সংশোধনী

আত-তাহরীক নভেম্বর'১৪ প্রশ্ন নং ৩৯/৭৯-এ সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে। সেখানে '৪ অংশ স্ত্রী, ৩ অংশ মা'-এর স্থলে '৩ অংশ স্ত্রী এবং ৪ অংশ মা' হবে।-সম্পাদক

* **এ মাসে মীলাদ প্রসঙ্গ বইটি পাঠ করুন ও অধিকহারে বিতরণ করুন!**
* **উক্ত উপলক্ষে প্রচলিত অনুষ্ঠানাদি ও বিদ'আত সমূহ পরিহার করুন!**
* **সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক ও পারিবারিক তা'লীমে মীলাদ প্রসঙ্গ বইটি পর্যালোচনা করুন!**